সেফ ফুড ডাইজেস্ট

বর্ষ ৪ সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০২৩



Eggs for a
healthy future

বিশ্ব ডিম দিবস

১৩ অক্টোবর ২০২৩

Water is life, water is food
Leave no one behind

বিশ্ব খাদ্য দিবস

১৬ অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশনায়

বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৩ ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন কমিটি

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড
BANGLADESH SOCIETY FOR SAFE FOOD

সূচিপত্র

○	মুখবন্ধ	০৩
○	বাণী	০৫
○	কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৪	১২
১	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য সরবরাহে প্রাণিসম্পদ খাতের অর্জন ও সম্ভাবনা	১৩
২	প্রাণিসম্পদ ভ্যালুচেইনে খাদ্য নিরাপদতা	১৭
৩	এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স: একবিংশ শতাব্দীতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় নতুন চ্যালেঞ্জ	২০
৪	পরিবেশের উপর খাদ্য ও খাদ্যাভাসের প্রভাব	২৪
৫	ওয়ান হেলথ ও খাদ্য নিরাপত্তা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত	২৭
৬	খাদ্য সংরক্ষণে ও সঠিক পুষ্টিগুণ রক্ষার্থে টেকসই প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার	৩১
৭	নিরাপদ ফসল উৎপাদনে জৈব উপাদানের ব্যবহার-একটি ভূমিকা	৩৪
৮	দুধের নিরাপদতায় গুড এনিমেল হাজবেন্ড্রী প্র্যাকটিস	৩৫
৯	ভেজাল যুক্ত খাদ্যের ঝুঁকি এবং তার প্রতিকার	৩৬
১০	কান নিয়েছে চিলে, ডিম খেয়েছে গুজবে	৪১
১১	মানসিক ও শারীরিক বিকাশে পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের অপরিহার্যতা	৪৪
১২	স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে এনক্যাপস্যুলেটেড প্রোবায়োটিক-এর গুরুত্ব	৪৫
১৩	খাদ্য পণ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পুষ্টিমান নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষণ প্রযুক্তি	৪৭
১৪	ডিম	৪৮
১৮	Food safety and public health concern in Bangladesh	৫১
১৯	Eggs for a healthy future	৫৪
১৭	বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিমূল্য	৫৫
১৮	ডিম কি কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়?	৫৬
১৯	খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাবার	৫৮
২০	সম্পাদকীয় প্রতিবেদন	৬০
২১	Water is life, water is food. Leave no one behind.	৬১
○	সেফ ফুড ডাইজেস্ট প্রকাশনা উপ-কমিটি ও সেমিনার আয়োজক উপ-কমিটি	৬২
○	প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দ	৬৩
○	Life Members	৬৪
○	ছবিতে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড এর কিছু কর্মকান্ড	৬৮



সদস্য সচিব
প্রকাশনা উপ-কমিটি
বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৩ ও
বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন কমিটি
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

মুখবন্ধ

একবিংশ শতাব্দীতে এ বিশ্বায়নের যুগে মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতে 'বিশ্ব ডিম দিবস' এবং 'বিশ্ব খাদ্য দিবস' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একদিকে নিরাপদ খাদ্য যেমন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, অন্যদিকে ডিম সবচেয়ে সহজলভ্য আমিষ জাতীয় খাবার গুলোর মধ্যে একটি। ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশে এ দিবস গুলো পালন করা হচ্ছে। বিশ্ব ডিম দিবসের মাধ্যমে জনগণকে ডিমের পুষ্টি উপাদান, দৈনিক খাদ্য তালিকায় ডিম এবং প্রতিদিন একটি করে ডিম খাওয়াকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্ব খাদ্য দিবসের মাধ্যমে সকল প্রকার নিরাপদ খাদ্য এবং নিরাপদ পানি ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড (বিএসএসএফ) দিবস দুটি স্মরণে ২০২০ সাল থেকে নিয়মিত ভাবে 'সেফ ফুড ডাইজেস্ট' স্মরণিকা প্রকাশ করে আসছে।

খাদ্য বাণিজ্যিকীকরণের এই যুগে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি একটি চ্যালেঞ্জ। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে খাদ্যপণ্যের দাম জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে খাদ্য উৎপাদনকারী, বাজারজাতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে একই সঙ্গে কাজ করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ যেমন চ্যালেঞ্জ, একই সঙ্গে প্রান্তিক পর্যায়ে খামারিদের স্বার্থ রক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এই এগিয়ে যাওয়ার পথ চলায় কেবলমাত্র বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়, প্রান্তিক পর্যায়ে খামারিদের স্বার্থ রক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে। দানাদার খাদ্য এবং প্রাণিজ খাদ্য উভয়ের ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্যের প্রথম ধাপ নির্ভর করে উৎপাদনকারীর উপর, কিন্তু উৎপাদনকারীকে পর্যাপ্ত তথ্য নিশ্চিত করা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সুবিধা প্রদান, উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক জোগাড় ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা শৃঙ্খল নিশ্চিত সম্ভব ।

'বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড' বাংলাদেশে সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সাধারন মানুষের মাঝে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমূহ- যেমন খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিশ্ব ডিম দিবস ও খাদ্য দিবস ২০২৩ উপলক্ষে চতুর্থবারের মতো বাংলা ভাষায় তথ্যবহুল, বিজ্ঞানসম্মত, সচেতনামূলক ও সুবিন্যস্ত একটি স্মরণিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

প্রকাশিত এ স্মরণিকাতে খাদ্য সম্পর্কিত সকল সেক্টর- যেমন পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য, ঔষধ, শাক-সবজি এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর ২১ টি প্রবন্ধ দিয়ে সাজানো হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, প্রবন্ধ গুলিতে প্রকাশিত তথ্যসমূহ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির করে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

সাধারণ মানুষের মাঝে বাংলা ভাষায় তথ্য প্রচার করলে সেটি স্বাভাবিকভাবে বোধগম্যতা বেশি পায়, সে বিষয়টিকে সামনে রেখে বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবসে বাংলা স্মরণিকা প্রকাশের এই উদ্যোগে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রবন্ধগুলো বাংলাতে হলেও বিভিন্ন সাইন্টিফিক শব্দ কিংবা মেডিকেল টার্মিনোলজি টাইপ করতে গিয়ে বানানের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো।

বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩ উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মরণিকায় যে সকল দেশ বরেণ্য ও প্রতিথযশা সম্মানীয় ব্যক্তিগণ মূল্যবান বাণী প্রদান করে আমাদেরকে স্মরণিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সফল করেছেন, তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

যে সকল সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী, বিজ্ঞানী, পুষ্টিবিদ, ভেটেরিনারিয়ান, মৎস্যবিদ, কৃষিবিদ প্রমুখ তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে প্রবন্ধ দিয়ে আমাদের এই স্মরণিকা কে পরিপূর্ণ করেছেন, তাদের প্রতি আমার এবং আমার কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সেই সকল কোম্পানিগুলোক যারা তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে আমাদের এই উদ্যোগকে সফল করেছেন।

বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩ উপলক্ষে এ স্মরণিকার প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা উপ-কমিটি, সেমিনার আয়োজক উপ-কমিটি এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সম্মানিত সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩ সফল হোক। দিবস দুটির তাৎপর্য ছড়িয়ে পড়ুক সকলের মাঝে। সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হোক।

প্রফেসর ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান শিকদার

Bangladesh Society for Safe Food

প্রকাশকাল...
অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশনায়...
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

সম্পাদনায়...
প্রফেসর ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান শিকদার

সহযোগিতায়...
ড. মো. রফিকুল ইসলাম
প্রফেসর ড. মো. খালেদ হোসেন
প্রফেসর ড. একেএম মোস্তফা আনোয়ার
ড. শেখ শাহিনুর ইসলাম
প্রফেসর ড. কেএইচএম নাজমুল হুসাইন নাজির
ডা. মোহাম্মদ সরোয়ার জাহান

গ্রাফিক্স ও প্রিন্টিং...
স্ক্যাচ গ্রাফিক্স, ময়মনসিংহ
০১৮২৩-৪২১৮৪২







ভাইস-চ্যান্সেলর
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

'বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৩' এবং 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩' এর উদযাপন উপলক্ষে 'বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড' বার্ষিক স্মরণিকা 'সেফ ফুড ডাইজেস্ট ২০২৩' প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি তাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বর্তমান বিশ্বে নিরাপদ খাদ্য ও ডিমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রতিবারের মতো এবারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে ১৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে "Eggs for a healthy future" শীর্ষক প্রতিপাদ্য বিষয়ে 'বিশ্ব ডিম দিবস' এবং ১৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে "Water is life, water is food. Leave no one behind." প্রতিপাদ্য বিষয়ে পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩'।

ডিম তুলনামূলকভাবে পুষ্টির সহজলভ্য উৎস। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বছরে একজন মানুষের ন্যূনতম ১০৪ টি ডিম খাওয়া প্রয়োজন। বিশ্ব ডিম দিবসের উদযাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হল ডিমের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং একই সাথে মানুষকে প্রতিদিন অন্তত একটা ডিম খেতে উদ্বুদ্ধ করা। ১৬ কোটিরও বেশি জনসংখ্যার এ দেশে বর্তমানে ডিমের উৎপাদন আশা ব্যঞ্জক। বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল (বিপিআইসিসি) এর তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রতিদিন প্রায় ৪.৫ কোটিরও বেশি ডিম উৎপাদিত হচ্ছে। ডিম উৎপাদনে এই হার দেশের লক্ষ্য মাত্রার প্রায় কাছাকাছি। আমি আশাবাদী সামনের দিনগুলোতে এই উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবে।

বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা প্রেক্ষাপটে বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদায় ২০৫০ সালের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ করতে হবে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা তখনই অর্জিত হবে যখন খাদ্য উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে একত্রিত ভাবে কাজ করতে পারবে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই দানাদার জাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তাছাড়াও ধান, পাট, আলু, সবজি, ফল, মাছ ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্ব স্বীকৃত। এই উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সাথে সাথে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বিশ্বব্যাপী প্রভাব এবং খাদ্য তৈরি কিংবা কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন কাঁচামালের খরচ বেড়ে যাওয়ায় খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করার জন্য সকলকেই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমান সরকার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে এই নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে খাদ্য উৎপাদ নের ধারাবাহিকতা সঠিক পথে আছে বলে আমি মনে করছি।

নিরাপদ খাদ্য এবং ডিম উৎপাদনে প্রান্তিক খামারী ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রান্তিক খামারির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও চাহিদাকে পূরণ করার লক্ষ্যে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সমন্বিতভাবে সকলকে কাজ করতে হবে। বর্তমান সরকারের সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এবং তারই ধারাবাহিকত সামনের দিনে প্রান্তিক কৃষক ও খামারীদের পর্যাপ্ত সেবা প্রধান নিশিত করার মাধ্যমে সকল নাগরিকের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যে কাজটি আছে, তাকে আরও বেগবান ও চলমান রাখতে হবে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ তথা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বছরে জনপ্রতি ৩০০ মিলি দুধ, ১৬০ গ্রাম মাংস এবং ২০৮ টি ডিম খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা হিসাব করা হয়েছে। প্রাণিসম্পর্কিত এই উৎপাদন কে নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে একত্রে কাজ করতে হবে।

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠালাভ থেকেই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ডিম, দুধ, মাংস সহ অন্যান্য কৃষিজ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত ও বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন বিভাগে প্রান্তিক খামারীদের চ্যালেঞ্জ ভিত্তিক গবেষণা, ডিম ও অন্যান্য খাদ্য উৎপাদনে চলমান গবেষণা সমূহ আরো জোরদার করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং উৎপাদনে লক্ষ্য মাত্রার কাছাকাছি আমাদের যে আজকের অবস্থান তার পেছনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত, খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড' সামনের দিনগুলোতে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি এই স্মরণিকার বহুল প্রচার আশা করছি এবং সংগঠনটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি ।

প্রফেসর ড. এমদাদুল হক চৌধুরী



ভাইস-চ্যান্সেলর
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩ এবং বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে 'বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড' এর স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ১৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশেও "Water is life, water is food. Leaving no one behind." প্রতিপাদ্যে পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২৩'। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সময়োপযোগী পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ফলে বিগত এক যুগে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ দানাদার জাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ধান, পাট, আলু, সবজি, ফল, মাছ, মাংস, ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্ব স্বীকৃত।

অন্যদিকে, "Eggs for a healthy future" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ১৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব ডিম দিবস'। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্যানুযায়ী, বছরে একজন মানুষের ন্যূনতম ১০৪টি করে ডিম খাওয়া প্রয়োজন। ডিম তুলনামূলকভাবে পুষ্টির সহজলভ্য উৎস। একটি ডিমে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন, ৫ গ্রাম উন্নত ফ্যাটি এসিড, ৭০-৭৭ কিলোক্যালরি শক্তি, ১০০-১৪০ মিলিগ্রাম কোলিন ও অন্যান্য পুষ্টি উপকরণ থাকে। এছাড়াও ডিমে থাকা লিউটিন ও জেক্সনথিন চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ডিমে থাকা ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন হৃদরোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

বাংলাদেশ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প-২০৪১ তথা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ রূপান্তরের লক্ষ্যে বছরে জনপ্রতি দুধ ৩০০ মিলি, মাংস ১৬০ গ্রাম ও ডিম ২০৮টি ধরা হয়েছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদফতর ডিম উৎপাদনের একটি প্রাক্কলন করেছে। সে হিসাব অনুযায়ী ২০৩১ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ডিমের বার্ষিক উৎপাদন হবে প্রায় ৩২৯৩.৪ কোটি এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৪৬৪৮.৮ কোটি। ২০২২-২০২৩ এ দেশে বাৎসরিক ডিমের চাহিদা ১৮০৬ কোটির তুলনায় দেশে উৎপাদিত ডিমের পরিমাণ প্রায় ২৩৩৭ কোটি। এটি দেশের সার্বিক পুষ্টির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মহামারী করোনার প্রভাবে আজ বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে সারা দেশে নিরবিচ্ছিন্ন খাদ্যশস্য ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখার চ্যালেঞ্জ অত্যন্ত সফলতার সাথে মোকাবেলা করছে এবং সেইসাথে প্রান্তিক কৃষক ও খামারিদের সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এসব কার্যক্রমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাও সত্যিই প্রশংসনীয়।

আমি 'বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড' এর এই আয়োজনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি এবং এই সোসাইটি দেশে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে এর কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবে, সেরকমটি প্রত্যাশা করছি।

প্রফেসর ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া



মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

বাণী

"বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড" কর্তৃক 'বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৩' এবং 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩' উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

১৯৯৬ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় প্রথম 'বিশ্ব ডিম দিবস' পালনের আয়োজন করে, যা পরবর্তী সময়ে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো 'বিশ্ব ডিম দিবস' পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য "Eggs for a healthy life".

আসছে ১৬ অক্টোবর 'বিশ্ব খাদ্য দিবস'। বাংলাদেশ প্রতিবছর বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপন করে থাকে। এই বছর 'বিশ্ব খাদ্য দিবস' ২০২৩ এর প্রতিপাদ্য হলো "Water is life, water is food. Leave no one behind."

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি'র দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাংলাদেশের কৃষির অগ্রযাত্রায় নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

'নিরাপদ খাদ্য, নিশ্চিত সুস্বাস্থ্য' এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড। আমি "বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড" এর সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

বাদল চন্দ্র বিশ্বাস



মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

বাণী

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড কর্তৃক "বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৩" এবং "বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩" উপলক্ষে স্মরণিকা বের হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। আমি "বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড" এর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। বাংলাদেশে ২০১৪ সাল থেকে দিবসটি ব্যাপক আকারে পালন করা হচ্ছে। ডিম দিবস উদযাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ডিমের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং একই সাথে মানুষকে প্রতিদিন অন্তত একটা ডিম খেতে উদ্বুদ্ধ করা। একটা ডিমে ৭ গ্রাম উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত প্রোটিন রয়েছে যেখানে প্রয়োজনীয় Essential Amino Acids এবং Minerals রয়েছে। যা মানুষের শরীর গঠনে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তাই ব্যাপক জনগোষ্ঠী পুষ্টিকর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বল্প খরচে ডিমের কোন বিকল্প নেই।

বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা বর্তমান সময়ের একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়। ধারনা করা হচ্ছে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দিতে ২০৫০ সালের মধ্যে ৫০-৭০% খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সমন্বিতভাবে এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য প্রাণিসম্পদ খাত হতে পারে অন্যতম। একইসাথে Sustainable Development Goals (SDG) অর্জনে বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ খাত মুখ্য ভূমিকা রেখে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ খাত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। ডিম এবং মাংস উৎপাদনে আমরা বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার।

এবারের বিশ্ব ডিম দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Eggs for a healthy future"। অপরদিকে বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিবাদ্য বিষয় "Water is life, water is food. Leave no one behind"। মানুষের জীবন ও জীবিকায় পানির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই উভয় দিবসের প্রতিবাদ্য বিষয়সমূহ অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ন। তাদের এই কর্মপ্রয়াসটি প্রসংশার দাবী রাখে। প্রতি বছর ব্যাপক প্রচার এবং প্রসারের কারণে জনগণের কাছে এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য পৌঁছে যাচ্ছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও অন্য সকল অংশিজনদের সাথে প্রাণিজাত পণ্যের নিরাপদতা বা ফুড সেফটি বিষয়টি প্রতিপালনের জন্য বিশেষ করে উৎপাদন হতে শুরু করে ভোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) আওতায় মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদনে সার্ভিলেন্স, মনিটরিং কাজ জোরদার করেছে। ফিডমিল/হ্যাচরী পরিদর্শন, পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন, উৎপাদন পর্যায়ে এন্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহার এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ফুড সেফটি বিষয়ক অসংগতিতে ব্যবস্থা গ্রহন করছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প যেমন এলডিডিপি এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ জোরদারকরণ প্রকল্প এ সেক্টরে ফুড সেফটি বিষয়টি প্রতিপালনের জন্য বর্তমানে কাজ করেছে। প্রাণিজাত পণ্যের গুনাগত মান নিরুপণে ঢাকার সাভারে আন্তর্জাতিক মানের একটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। যা আইএসও ৯০০১ এবং আইএসও ১৭০২৫ সনদপ্রাপ্ত। ফলশ্রুতিতে প্রাণিজাত পণ্যের ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন সামগ্রীর নিরাপদতা ও গুনাগত মান নিরুপণে এ দপ্তরের সক্ষমতা বহুগুন বৃদ্ধি করেছে। যা প্রাণিজাত পণ্যের রপ্তানিতে সহায়ক হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গৃহিত কার্যক্রমের ফলে খামারীরা আগের তুলনায় অনেক বেশী সচেতন হয়েছেন। তারা গবাদিপশু-পাখি উৎপাদনে ফুড সেফটির ব্যবস্থাপণা অনুশীলণ করছেন। যার ফলে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ নিশ্চিত হচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখছে।

আমরা সবাই জানি, জনস্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খারার অত্যন্ত জরুরী এবং যা দৈহিক ও মানষিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে। সে কারনে খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজটি কারও একার নয়। সে জন্য বলা হয় "Food safty is a shared responsibility" অর্থ্যাৎ ফুড সেফটি অংশিজনের সম্বলিত দায়িত্ব। প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদনকারী, ভোক্তা, সিভিল সোসাইটি, সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সকলেই এ নিয়ে কাজ করতে হবে। যাতে করে আমরা ভোক্তা পর্যায়ে একটা নিরাপদ খাদ্য পেতে পারি।

আমি "বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড" এর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এই স্মরণিকাটির বহুল প্রচারের আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

ডাঃ মোঃ এমদাদুল হক তালুকদার



সভাপতি
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

বাণী

"বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড" এর উদ্দোগে বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৩ ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে "সেফ ফুড ডাইজেষ্ট" এর ৪র্থ বর্ষ-১ সংখ্যা-১ এর প্রকাশকালে সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের মানুষকে পুষ্টিসমৃদ্ধ, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করার মহান ব্রত নিয়ে ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড"। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই সোসাইটি নিয়মিতভাবে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্স আয়োজন সহ সায়েন্টিফিক জার্নাল ও স্মরণিকা প্রকাশের মাধ্যমে জনগণকে নিরাপদ, ভেজালমুক্ত ও পুষ্টিকর খাবারের বিষয়ে সচেতন করে আসছে। বাংলদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও অধিকাংশ জনগণের মধ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ, সুষম খাবার গ্রহণের বিষয়ে সচেতনতার যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে। এছাড়া মানুষের অজ্ঞতা ও অসাধুতার কারণে খাবার হয়ে পড়ছে ঝুকিপূর্ণ। এর মধ্যে ভেজালযুক্ত খাবার, খাদ্যে কিটনাশক ও ক্ষতিকর রাসায়নিকের উপস্থিতি, ভারী ধাতু ও এন্টিবায়োটিকের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। খাদ্যে অনোনুমোদিত রাসায়নিক ও কীটনাশকের উপস্থিতির কারণে মানুষ-এর বিষক্রিয়ার শিকার হচ্ছে। ফলে মানুষের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং মানুষের শরীরে দেখা দিচ্ছে ক্যান্সারসহ নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যা। অন্যদিকে মানুষের অসচেতনতার কারণে খাদ্য দূষিত হচ্ছে নানাবিধ সংক্রামক জীবাণু দ্বারা। এসকল খাদ্যবাহিত ক্ষতিকর সংক্রামক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মানুষ ভূগছে নানাবিধ জটিল রোগে। এসকল বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরীর উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড" নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আগামী ১৩ অক্টোবর পালিত হতে যাচ্ছে বিশ্ব ডিম দিবস। বাংলাদেশে ২০১৩ সাল থেকে এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছর এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো "Eggs for a healthy future"। এই প্রতিপাদ্যের মূল লক্ষ্য হলো পুষ্টিগত, সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে টেকসই ফলাফল উন্নয়নের মাধ্যমে সকলের জন্য স্বাস্থকর ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকরণে ডিমের শক্তিকে সকলের নিকট দৃষ্টিগোচর করা। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্যানুযায়ী বছরে একজন মানুষের নুন্যতম ১০৪ টি করে ডিম খাওয়া প্রয়োজন। সেই হিসেবে বাংলাদেশে ডিমের উৎপাদন কিছুটা হলেও স্বস্তিদায়ক। প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের "লাইভষ্টক ইকোনমির" তথ্যানুসারে ২০২২- ২০২৩ অর্থবছরে ২ হাজার ৩ শত ৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ডিম উৎপাদিত হয়েছে, অর্থাৎ মাথাপিছু উৎপাদিত ডিমের পরিমাণ হচ্ছে ১৩৫ টি।

অন্যদিকে ১৯৮১ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র ও ক্ষুধা নিবৃত্তির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশ্বের ১৫০টির বেশী দেশে বিশ্ব খাদ্য দিবস গুরুত্বের সাথে পালিত হয়ে আসছে। আগামী ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস। এ বছর এ দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো "Water is life, water is food. Leave no one behind"। এই প্রতিপাদ্যের মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব রক্ষায় এবং আমাদের খাদ্যের ভিত্তি হিসেবে পানির অপরিসীম গুরুত্বকে সবার দৃষ্টিগোচর করা। রাসায়নিকমুক্ত, জীবাণুমুক্ত খাদ্য যেমন আমাদের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি জীবাণুমুক্ত ও ভারী ধাতুমুক্ত নিরাপদ পানিও আমাদের জীবণের জন্য অপরিহার্য।

এদেশের মানুষের জন্য নিরাপদ খাবার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে একাত্ম হয়ে "বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড" নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সোসাইটি তার কর্মপরিধি বিস্তৃত করে মানুষের কল্যাণে অনন্তকাল ধরে কাজ করুক- সকলের নিকট এই আশীর্বাদ কামনা করছি।

প্রফেসর ড. মো. খালেদ হোসেন



সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

বাণী

বর্তমান সময়ে বিশ্ব ডিম দিবস এবং বিশ্ব খাদ্য দিবস দুটোই অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ন। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার বিশ্ব ডিম দিবস এবং ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস হিসেবে বিশ্বব্যপী পালন করা হয়। ১৩ অক্টোবর ২০২৩ বিশ্বব্যপী বিশ্ব ডিম দিবস পালিত হবে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হলো "Eggs for a healthy future" অর্থাৎ সুস্থ্য ও মেধাবী জাতি গঠনে সুপার ফুড ডিমের কোন বিকল্প নাই। কোভিড-১৯ সহ যে কোন মহামারী ও অতিমারীতে শরীরে বিপুল পরিমানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ডিমের ভূমিকা অপরিশীম। অপর দিকে ১৬ অক্টোবর ২০২৩ বিশ্বব্যপী বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হবে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হলো "Water is life, water is food. Leave no one behind"। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (এফএও) পানি এবং খাদ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ বিশ্বব্যাপী নিরাপদ খাদ্যের যেমন দরকার, ঠিক তেমনি নিরাপদ পানিও অপরিহার্য্য। বিশ্বে পরিবেশ দূষণ, জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে প্রতিনিয়ত বিশুদ্ধ পানি কমছে এবং এই পানির কারণে নিরাপদ খাদ্যও হুমকিতে পড়েছে। তাই পানি এবং খাদ্য কোনটিকেই বাদ দিয়ে বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

বিশ্বব্যপী প্রায় ৮৫০ কোটি মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির যোগান সম্ভব হলেও নিরাপদ খাদ্যের যোগান দেওয়া এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। আমাদের বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশ প্রাণিজ আমিষ যেমন- দুধ, ডিম, মাছ, মাংস এবং খাদ্য শষ্য উৎপাদনে সম্প্রতি স্বনির্ভরতা অর্জন করলেও সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন এখনও নিশ্চিত হয়নি।

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড (বিএসএসএফ) ২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকল্পে জনগনের মাঝে এ বিষয়ে সচেতনতা তৈলীর লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রনালয়, কৃষি মন্ত্রনালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্য করে ৪র্থ বারের মতো এবারও তথ্যবহুল, বিজ্ঞান সম্মত ও সচেতনতা মূলক সুবিন্যস্ত একটি স্যুভেনির বাংলায় প্রকাশের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। এছাড়াও ১৪ অক্টোবর ২০২৩ ঢাকাস্থ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড (বিএসএসএফ) একটি সেমিনারের আয়োজন করেছে। উক্ত সেমিনারে প্রফেসর ড. শহীদুর রশিদ ভূঁইয়া, মাননীয় উপাচার্য, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

প্রকাশিত এই স্যুভেনিরটি পোল্ট্রি, ডেইরী, মৎস্য, ঔষধ, শস্য ও শাক-সব্জী এবং এগুলো থেকে উৎপাদিত পন্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত করন, বিপণন, বাজারজাত করণ বিষয়ের উপর প্রবন্ধ দিয়ে সাজানো হয়েছে। আমার বিশ্বাস প্রবন্ধগুলো থেকে পাঠকগন বেশ উপকৃত হবেন। আশা করি প্রকাশিত এ স্যুভেনির বাংলাদেশের জনগনের কল্যাণে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এই স্যুভেনিরে যে সকল দেশবরেণ্য ও প্রথিতযশা সন্মানীয় ব্যক্তিগন মূল্যবান বাণী প্রদান করে আমাদের এই স্যুভেনিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সফল করেছেন তাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে প্রকাশনা উপ-কমিটি, সেমিনার আয়োজক উপ-কমিটি এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সন্মানিত সদস্যদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ রইলো। আমি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড (বিএসএসএফ) এর সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করি। বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩ সফল হোক। সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হোক, এ আমার প্রত্যাশা।

ডা. মোহাম্মদ সরোয়ার জাহান



আহবায়ক
প্রকাশনা উপ-কমিটি
বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৩ ও
বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩
উদযাপন কমিটি
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

বাণী

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড (বিএসএসএফ) কর্তৃক "বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৩" এবং "বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩" উপলক্ষে "Safe Food Digest" ২০২৩ প্রকাশের উদ্যোগে আমি সহযাত্রী হতে পেরে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত।

বাংলাদেশে ২০১৪ সাল থেকে বিএসএসএফ খাদ্য নিরাপদতা (Food Safety) নিশ্চিত করতে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী/বিশেজ্ঞদের সাথে আলোচনা সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কসপের আয়োজন করে আসছে। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত, মান নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ে খামারী/উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ধারারবাহিকতায় "Safe Food Digest" ২০২৩ প্রকাশিত হচ্ছে।

ডিম দিবস উদযাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ডিমের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং একই সাথে মানুষকে প্রতিদিন অন্তত একটা ডিম খেতে উদ্বুদ্ধ করা। কারন ডিমে রয়েছে পযাপ্ত পরিমান প্রোটিন ও প্রয়োজনীয় Essential Amino Acids এবং Minerals যা মানুষের শরীর গঠনে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ব্যাপক জনগোষ্ঠী পুষ্টিকর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বল্প খরচে ডিমের কোন বিকল্প নেই। ডিমের গুনগত মান নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে ১৯৯৬ সাল হতে দিবসটি পালন করে আসছে। বিশ্ব ব্যাপী অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার "বিশ্ব ডিম দিবস" পালন করা হয়ে থাকে। এ বছর আগামী ১৩ অক্টোবর এ দিবসটি পালন করা হবে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ও পেশাজীবি সংগঠনসমূহ এ দিবসটি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ বছরে বিশ্ব ডিম দিবসের প্রতিবাদ্য বিষয় "Eggs for a healthy future"। বিশেষজ্ঞদের মতে ডিম শুধু স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাদ্য নয়, ডিমে রয়েছে রোগ প্রতিরোধের চমৎকার অবদান। গবেষণা বলছে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ দৈনিক ২টি করে ডিম খেলে শরীরে কোন প্রকার সংক্রামক রোগ অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য মতে বর্তমানে একজন বাংলাদেশী গড়ে ১৩৪টির অধিক ডিম খেয়ে থাকেন। দেশে ডিম উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পণা ২০২১-৪১ বাস্তবায়নে দেশে ডিম উৎপাদন দ্বিগুন করতে হবে।

অপরদিকে বিশ্বে মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ, দরিদ্র ও পুষ্টিহীনতা দুর করে ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ার প্রত্যয়ে ১৯৪৫ সাল হতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কার্যক্রম শুরু করে। মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে ১৯৮১ সাল হতে দিবসটি পালন শুরু হয়। প্রতি বছর ১৬ অক্টোবর বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে নানা আয়োজনে পালিত হয় বিশ্ব খাদ্য দিবস। এ বছর বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিবাদ্য বিষয় "Water is life, water is food. Leave no one behind"। পৃথিবীর জন্য পানি অত্যাবশ্যকীয়। আমাদের দেহের ৭০% পানি দিয়ে তৈরী। কৃষি কাজে, গবাদিপশু লালন-পালনে, মৎস্য চাষে পানি প্রয়োজন; যা আমাদের খাদ্য সরবরাহ এবং জীবন ও জীবিকার চালিকা শক্তি। তাই এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন এবং বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সর্বোপরি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড এর উদ্যোগে প্রকাশিতব্য স্যুভিনিরে যাঁরা লেখা পাঠিয়েছেন, রিভিউ ও ডিজাইন, পরামর্শ প্রদান করেছেন এবং প্রকাশনা উপ-কমিটির সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে আমি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি "বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৩" এবং "বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩" উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সকলকে ধন্যবাদ।

ড. শেখ শাহিনুর ইসলাম

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড
কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৪

সভাপতি



প্রফেসর ড. মো. খালেদ হোসেন
মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ,
ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সাইন্সেস অনুষদ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

সাধারণ সম্পাদক



ডা. মোহাম্মদ সরোয়ার জাহান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সেইফ বায়ো প্রোডাক্টস্ লি.

সহ-সভাপতি-১



প্রফেসর ড. এ.কে.এম মোস্তফা আনোয়ার
মাইক্রোবায়োলজি এন্ড পাবলিক হেলথ বিভাগ
এনিমেল সায়েন্স এন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সহ-সভাপতি-২



ড. মো. নুরে আলম সিদ্দিকী
আন্তর্জাতিক কনস্যালট্যান্ট (ওয়ান হেলথ)
বিশ্ব প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থা, এসিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক
রিপ্রেজেন্টেশন, টোকিও, জাপান

যুগ্ম-সম্পাদক



ড. আমিনা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক, প্যাথলজি বিভাগ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

কোষাধ্যক্ষ



প্রফেসর ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান শিকদার
ফার্মাকোলজি বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ

প্রকাশনা সম্পাদক



ড. শেখ শাহিনুর ইসলাম
ডেপুটি চিফ ইপিডেমিওলজিস্ট
বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অফিস, ঢাকা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সমাজ কল্যাণ সম্পাদক



প্রফেসর ড. সুলতান আহম্মেদ
মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক



ড. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রধান
সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর

সাংগঠনিক সম্পাদক



প্রফেসর ড. মো. শরিফুল ইসলাম
ভেটেরিনারি ও এনিমেল সায়েন্সেস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য



ডা. এ.কে.এম. খসরুজ্জামান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইস্টার এগ্রো বিডি লি.

সদস্য



প্রফেসর ড. আব্দুল্লাহ ইকবাল
ডিপার্টমেন্ট অব ফুড টেকনোলজি এন্ড রোরাল ইন্ডাস্ট্রি
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

সদস্য



মোহাম্মদ তারেক সরকার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফিসটেক হ্যাচারী লি.

সদস্য



প্রফেসর ড. মো. মহিদুল হাসান
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, কৃষি অনুষদ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য



ড. জাকিয়া রহমান মনি
প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার (নিউট্রিশন)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

এক্স অফিসিও
সদ্য সাবেক সভাপতি



ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম
চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার (লাইভস্টক ডিভিশন)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা

এক্স অফিসিও
সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক



প্রফেসর ড. কেএইচএম নাজমুল হুসাইন নাজির
মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ
ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য সরবরাহে প্রাণিসম্পদ খাতের অর্জন ও সম্ভাবনা

ড. এ.বি.এম. খালেদুজ্জামান, পরিচালক, উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

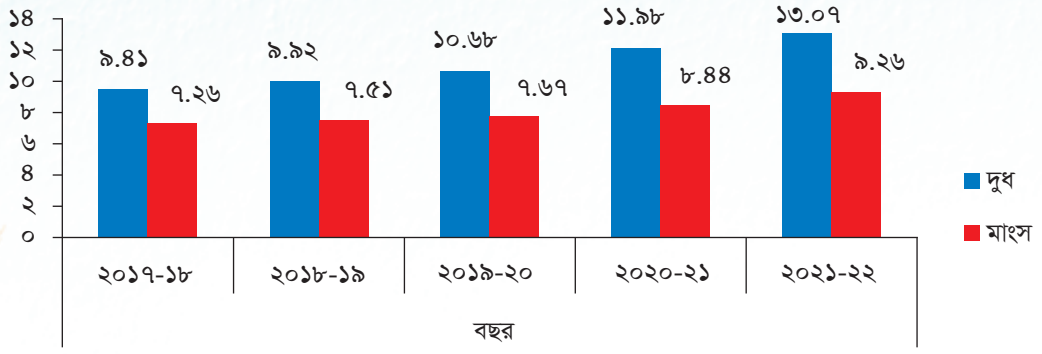
কৃষি প্রধান জনবহুল বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম পুষ্টি, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, জমির উর্বরতা এবং মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রাণিসম্পদ উপখাত অবদান রেখে চলেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের কল্যাণ সাধন, জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে। জনসাধারণের জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত প্রাণিজাত খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান, সংক্রামক ব্যাধির ঝুঁকি থেকে মুক্তি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাণিজাত পণ্য ও উপজাতের প্রবেশের জন্য গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধানে কার্যকরী ভূমিকা রেখে চলেছে। এ ছাড়াও প্রাণিসম্পদের জীব নিরাপত্তা বিধান ও পরিবেশ সংরক্ষণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বেকারত্ব হ্রাসকরণ, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি সংক্রান্ত নীতিমালা, আইন ও বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দূর্যোগকালীন সময়ে জরুরী প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রণীত রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ বাস্তবায়ন করতে সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে ঘোষিত "ক্ষুধা মুক্তি" অর্জনে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণে টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮৫ শতাংশ, প্রবৃদ্ধির হার ৩.২৩ শতাংশ এবং মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৬.৫২ ভাগ। তাছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭৩,৫৭১ কোটি টাকা। জনসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দুধ, মাংস, ডিমের সাথে এ সব পণ্য থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদসত্বেও, সরকারের নীতি ও কৌশলের ফলে ব্যক্তি খাতের উদ্যোগের কারণে চাহিদা ও উৎপাদনের ব্যবধান ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে।

প্রাণিসম্পদ খাতে সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। সরকারের উন্নয়ন দর্শন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত অষ্টম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় (২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫) প্রাণিসম্পদ সেক্টরের অর্জিতব্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের ফলে প্রাণিসম্পদজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে ।

১. স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭১-৭২ অর্থবছরে দেশে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন, ৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১৫০ কোটি, যা বর্তমানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪০.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন, ৮৭.১০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ২৩৩৭ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। উক্ত পরিসংখ্যানই বলে দেয়, পুষ্টিসমৃদ্ধ এসকল খাদ্য উপাদাসমূহ অর্থাৎ দুধ, মাংস ও ডিমের প্রতি মানুষের আগ্রহ ক্রমশই বাড়ছে। বর্তমানে দুধ, মাংস ও ডিমের প্রাপ্যতা যথাক্রমে ২২১.৮৯ মিলি/জন/দিন, ১৩৭.৩৮ গ্রাম/জন/ দিন এবং ১৩৪টি/জন/বছর। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় ২৫০ মিলি/প্রতিদিন/জনপ্রতি দুধের চাহিদার বিপরীতে চলতি ২২২ মিলি প্রাপ্যতার স্থলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৫০ মিলি প্রাপ্যতার লক্ষমাত্রা, ১২০ গ্রাম/প্রতিদিন/জনপ্রতি মাংসের চাহিদার বিপরীতে চলতি ১৩৭.৩৮ গ্রাম প্রাপ্যতার স্থলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৫০ গ্রাম প্রাপ্যতার লক্ষমাত্রা এবং ১০৪ টি/প্রতিদিন/জনপ্রতি ডিমের বিপরীতে চলতি ১৩৪টি প্রাপ্যতার স্থলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৬০ টি প্রাপ্যতার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।



চিত্র-১: বিগত ৫ বছরে দুধ ও মাংস উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)

২. প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে ২০২২ সনে দেশে কোরবাণীর জন্যে প্রস্তুত গবাদীপশুর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২১ লক্ষ ২৪ হাজার এবং কোরবাণীতে জবাইকৃত গবাদীপশুর সংখ্যা ছিল ৯৯ লক্ষ ৫৪ হাজার এবং এতে আর্থিক লেনদেন ছিল ৬৩৬৮৬.২৬ কোটি টাকার। এ নিয়ে টানা ৪র্থ বার নিজস্ব উৎপাদন থেকে দেশের জনগণের কোরবাণীর চাহিদার শতভাগ মেটানো সম্ভব হয়েছিল।

৩. বর্তমানে এ খাতে বিনিয়োগের পরিমান ২৫ হাজার কোটি টাকার অধিক এবং গার্মেন্টেসের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থান খাত হিসেবে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ জড়িত।

৪. গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের নিমিত্তে পরিচালিত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের জন্য "প্রোজেনী টেষ্টেড বুল" উৎপাদন করা হয়েছে যা আমাদের গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই সরকারী পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে লিঙ্গ নির্ধারিত সিমেন এর ব্যবহার শুরু হয়েছে যা প্রাণিসম্পদ খাতে কাংখিত লক্ষমাত্রা ছাড়িয়ে যেতে সহায়ক হবে, রচিত হবে অন্য এক মাইল ফলক।

বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে ২০২৪ সালে উন্নীত হতে যাচ্ছে। তাই পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশের তালিকায় উন্নীত হতে গেলে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রাণিজ আমিষের আধিক্য বাড়াতে হবে। কারণ উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন পূরণে সবার আগে প্রয়োজন পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ। তাই দুধ, মাংস ও ডিমের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং স্কুল ফিডিং এর মাধ্যমে দুধ পানের অভ্যাস জনপ্রিয়তা লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রতিবছর প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ পালন করে থাকে। প্রতিবছর ০১ জুন "দুধ পানের অভ্যাস গড়ি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ করি" প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস পালন করা হয়। ডিমকে বিশ্বে একটি উন্নতমানের ও সহজলভ্য আমিষ জাতীয় খাদ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আন্তর্জাতিক Egg Commission প্রতিবছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার বিশ্ব ডিম দিবস পালন করে আসছে। ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশে ও দিনটি পালন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সাল থেকে ঈদ-উল-আযহায় দেশীয় গবাদিপশু দ্বারা কোরবানির চাহিদা পূরণ হয়ে আসছে।

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে ও ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ২.২১ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র খামারী ও কৃষকদেরকে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি লালন পালনের উপর প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রাণি চিকিৎস কর্তৃক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দারিদ্র বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যার প্রতিফলন বাংলাদেশ এলডিসি থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তোলন করেছে।

প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সেবার মান উন্নত এবং যুগপোযোগী করা, সেবা গ্রহীতাদের সাথে আরো নিবিড় সমন্বয় সাধন করা, প্রাণিসম্পদ খাতের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখা, পুষ্টি নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ খাত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথম প্রুভেন বুল (Proven Bull) ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রুভেন বুল এর সংখ্যা ০৮টি । গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭২টি কেনডিডেট বুল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।



চিত্র-২: কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন কেন্দ্র সাভার ঢাকায় বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্রুভেন বুল

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য মোট ১৭ প্রকারের টিকা উৎপাদন, বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে। রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা, ডিজিজ সার্ভিলেন্স, ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ দমন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। ই-প্রাণিসম্পদ সেবা, আইসিটি উন্নয়ন, উদ্ভাবনী কার্যক্রম, প্রাণিসম্পদ সহায়ক মোবাইল এ্যাপ এবং সফ্টওয়ার ভিত্তিক রিপোর্টিং চালুর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ায় অগ্রসরমান। প্রাণিবর্জ্য, পশু জবাইজাত উপকরণ, ঔষুধ উৎপাদন ও ব্যবহার, পরস্পর সংক্রমণযোগ্য (জুনোটিক) রোগ দমন, আর্বিভূত ও পুনঃরাবির্ভূত রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রাণিসম্পদ খাতের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।



চিত্র-৩: করোনা মহামারীর সময়কালে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাধানে ভ্রাম্যমান দুধ বাজার

করোনা মহামারির মধ্যেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আপামর মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। গত অর্থ বছরে করোনা মহামারিতে খামারিদের মাঝে ৯৫০০ কোটি টাকার দুধ, মাংস ও ডিম ভ্রাম্যমান বাজারের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবছরেও দুধ, মাংস ও ডিম ভ্রাম্যমান বাজারের মাধ্যমে বিক্রয় অব্যাহত আছে।

পশুখাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে গৃহিত কার্যক্রম:

পশুখাদ্যে ভেজাল রোধের জন্য ইতোমধ্যে মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন এবং পশুখাদ্য বিধিমালা অনুমোদিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এবং পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩ এর আওতায়-১। ফিডমিল, পশুখাদ্য উপকরণ আমদানী ও বিক্রয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে ১৩,৫২৪ টি; পশূখাদ্য নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫,২৯১টি; মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে ৭৩৭টি; জব্দকৃত ও বিনষ্টকৃত ভেজাল পশুখাদ্য ৩৪৮.৬ মেট্রিক টন; কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে ১০ জনকে; আদায়কৃতজরিমানার পরিমাণ ৩১.১৫ লক্ষ টাকা।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রণীত অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অব্যাহত প্রবৃদ্ধির চলমান ধারার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যেই ভিশন ২০৪১ এর লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করত: প্রযুক্তিঘণ শিল্পমানসম্পন্ন প্রাণিসম্পদ কার্যাবলী জোরদার করা হয়েছে। দৈনিক জনপ্রতি ৩০০ মিলি (২৪.৪৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন) দুধ, ২০৮ (৪৬৪৮৮ মিলিয়ন) টি ডিম ও ১৬০ গ্রাম (১১.৬৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন) মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যস্থির করা হয়েছে (২০৪১ সালে প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা ২২৩.৫ মিলিয়ন ধরা হয়েছে)। এ সময় দুধ, ডিম ও মাংসের প্রাক্কলিত যোগান ৩০ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ৪৫৫০০ মিলিয়ন এবং ১২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ফলশ্রুতিতে সরকারের রুপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে রুপান্তরের লক্ষ্যে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রাণিসম্পদ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সেবার মান উন্নত এবং যুগপোযোগী করা, সেবা গ্রহীতাদের সাথে আরো নিবিড় সমন্বয় সাধন করা, প্রাণিসম্পদ খাতের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখা, পুষ্টি নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ খাত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

RESPOFIT

Supportive for respiratory health

Characteristics

RESPOFIT contains a unique blend of essential oils and allicin which supports the respiratory health due to diseases, management or environmental challenges. During respiratory challenges poultry birds have decreased feed & water consumption which severely effects performance, compromised immunity and mortality can range between 10-80%.

Major Ingredients

Menthol, Eucalyptus oil, Peppermint oil, Oregano oil, Thyme oil, Allicin

Properties

- Expectrorant, mucolytic, antimicrobial, anti-allergic and bronchodilator
- Sooths the respiratory system and keeps it clean to ensure normal breathing
- Improves immunity and helps in overcoming stress



Dosage

Preventive : 1ml / 10 liter water
Curative : 1ml / 5 liter water

Administer dosage in morning drinking water as above, or as directed by a veterinary practitioner

Packing

500 ml & 1 litre



nutréssa
Kasteelstraat 152 B 8700 TIELT W-VL Belgium
At: Village Badshapur, Shakumbhri Devi Road, Shaharanpur (UP, India
Website:www.nutressa.be, E-mail: info@nutressa.be

Novivo
Marketed by:
Novivo Healthcare Limited
Mohakhali, Dhaka-1206, Bangladesh
www.novivo.com.bd

প্রাণিসম্পদ ভ্যালুচেইনে খাদ্য নিরাপদতা

ডা. এইচএম তাছলিমা আক্তার, এডিপিসি, বাংলাদেশ; **ড. শেখ শাহিনুর ইসলাম,** ডেপুটি চিফ ইপিডেমিওলজিস্ট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
ই-মেইল: s_islam73@live.com, মোবাইল: ০১৭১২ ১৮ ২৪০৭

খাদ্য নিরাপদতা (Food safety) মানবস্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে তথা প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদনে উত্তম চর্চা প্রতিপালনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রাণিসম্পদ খাদ্য উৎপাদনে তথা খামারীদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাণিস্বাস্থ্য, প্রাণিকল্যাণ, ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদনে খাদ্য নিরাপদতার বিষয়সমূহ প্রতিপালনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যা এসডিজি এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন, ভিশন ২০৪১ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ এর সাথে সমন্বয়করে প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন বলয়ের বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে খামার, জবাইখানা এবং পরবর্তী ভোক্তাপর্যায়ে সরবরাহের ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপদতার মাপকাঠিসমূহ প্রতিপালনে সহায়তা প্রদান করছে। এ ছাড়া জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণ, ভেটেরিনারি এন্টিমাইক্রোবিয়ালের যথাযথ ব্যবহার, এবং একই সাথে প্রাণিজাত পণ্যে এর অবশিষ্টাংশের (Residues) নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে। যা প্রতিপালন না করলে সম্ভাব্যভাবে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। সে কারনে প্রাণিসম্পদ খাদ্য উৎপাদনে এপিডেমিওলজিক্যাল নজরদারি, ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ বিষয়ক কর্মপ্রয়াস খাদ্য নিরাপদতা ব্যবস্থাপণায় খুবই গুরুত্বপূর্ন।

প্রাণিসম্পদ খাতে মুলত: তিনটি ভ্যালুচেইন বিদ্যমান, যথা পোল্ট্রি, বিফ ও ডেইরী ভ্যালু চেইন। উক্ত ভ্যালু চেইনসমূহে সম্পৃক্ত সকল অংশিজনদের জনসচেতনতা উন্নিতকরণসহ এর সকল স্তরে উত্তম চর্চা বাস্তবায়ন করা জরুরী। প্রতিটি ভ্যালু চেইনের জন্য প্রযোজ্য একটি খাদ্য নিরাপদতা/ফুড সেফটি বিষয়ক নির্দেশিকা (Guidelines) প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যা বাংলাদেশে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে খাদ্য নিরাপদতার প্রধান শর্তাদি বাস্তবায়নে নীতি-নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রকদের সহায়তা প্রদান করবে এবং তা উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, সরবরাহ চেইনের সাথে সংশ্লিষ্ট জনবল এবং এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত সুবিধাভোগিদেরও কাজে লাগবে। নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এবং সরকারী বিভিন্ন সংস্থা ও রপ্তানি বাজারের চাহিদা মেটাতে নিরাপদ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ, পদ্ধতি ও চর্চার বিষয়ে সহায়তা প্রদান করবে।

(ক) পোল্ট্রি ভ্যালু চেইন: বাংলাদেশে পোল্ট্রি সাপ্লাই চেইন অন্যান্য এশিয়ার দেশগুলোর মতোই একই ধরনের। এই ভ্যালু চেইনের যে সকল অংশিজন রয়েছে যেমন খামারী, পাইকারী বিক্রেতা, পরিবহনকারী, পাইকারী ও খুচরা বাজার, যারা ভোক্তা ও ক্রেতাদের মধ্যে পোল্ট্রি পণ্য পৌছে দিয়ে থাকে। জীবনিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় এনে বাংলাদেশের পোল্ট্রি সেক্টরকে প্রধানত ৪টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। তন্মধ্যে সেক্টর-৩ ও ৪ অপেক্ষাকৃত কম জীবনিরাপত্তা অনুশীলন করে থাকে এবং এ সেক্টর দুইটিটি দেশের প্রায় ৮০ ভাগ পোল্ট্রি সরবরাহ করে থাকে। সাধারনত ৯৫% মুরগি প্রথাগত কাঁচাবাজারে (Live Bird Market) বিক্রি হয়। যেখানে জবাই ও মাংস প্রক্রিয়া কার্যক্রমে পরিস্কার পরিচন্নতার ঘাটতি রয়েছে । কিন্তু <৫% মুরগির মাংস ফ্লোজেন/হিমায়িত মাংস হিসেবে বিক্রি হয়। যেখানে খাদ্য নিরাপদতার সকল মাপকাঠিসমূহ/উত্তম অনুশীলন প্রতিপালন করা হয়।

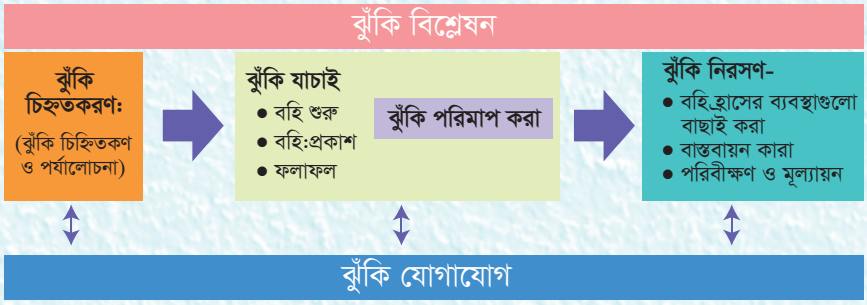
(খ) বিফ ভ্যালু চেইন: বাংলাদেশে জনসাধারনের জন্য গরুর মাংস সরবরাহ করা হয় প্রধানত দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে, যথা (১) প্রথাগত(Traditional system) এবং আধুনিক (Modern system)। প্রথাগত পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের মাংসের প্রায় ৯৫% এর অধিক সরবরাহ করে। খামারীর বাড়ীতে যে সকল বাছুর জন্ম গ্রহন করে সেগুলো জবাইয়ের জন্য লালন-পালন করে বড় করা হয়। কিন্তু বানিজ্যিকভাবে গবাদিপশু হৃস্টপুষ্টকরণের জন্য বাছুর-গরু পার্শবর্তীদেশ হতে অনিয়মিত বানিজ্যের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। গ্রাম ও শহুরের প্রায় সকল জনগন প্রথাগত পদ্ধতিতে জবাইকরা গবাদিপশুর মাংস খেতে পছন্দ করেন। কিন্তু এ জবাই ব্যবস্থাপণা (গ্রাম ও শহুরে) যেমন অবকাঠামো, মিট ইনেসপেকশন ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে জবাই উশ্লিষ্টাংশ অপসরনের বিষয়টি এখনও তেমন গুরুত্ব পায়নি।

গ) মিল্ক ভ্যালু চেইন: লালনপালণকৃত গবাদিপশুর দুধ পারিবারিকভাবে ব্যবহারের পর অতিরিক্ত অংশ বিক্রি করা হয়। বাংলাদেশে >৮০% ক্ষেত্রে প্রথাগত অনিয়মিত পদ্ধতিতে এই দুধ বিক্রি করা হয় এবং প্রায় ৫% ক্ষেত্রে বানিজ্যিকভাবে প্রক্রিয়াকরণের জন্য সংগ্রহ করা হয়। সাধারনত দুধ সংগ্রহকারী/গোয়ালা খামারীদের কাছ হতে দুধ সংগ্রহ করে শহরের খুচরা বাজারের বা গৃহস্থলীতে খাওয়ার জন্য বা চিলিং প্লান্টে প্রক্রিয়ার জন্য সরবরাহ করে থাকে। দুধ প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠান এই দুধ পাস্তুরিত/ইউএসটি মিল্ক/ অন্য প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধ পণ্য শহুরের জনগোষ্টির মধ্যে সরবরাহের জন্য তৈরী করে থাকে। এখনও দুধ উৎপাদনে খামার পর্যায়ে উত্তম চর্চার কমতি রয়েছে। একইসাথে দুধ সংগ্রহকারী/গোয়ালদের উত্তম স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনে ঘাটতি রয়েছে। তবে বানিজ্যিকভাবে গড়ে উঠা দুধ উৎপাদনের গাভীর খামার হতে সংগৃহিত দুধ সাধারনত প্রক্রিয়াকরণের পর বিক্রি হয়।

প্রাণিসম্পদ ভ্যালু চেইনের খামার থেকে শুরু করে খাবার টেবিল পর্যন্ত উত্তম চর্চার প্রতিপালনের সাথে সম্পৃক্ত। যা অনুশীলন না করলে বিপত্তি (Hazard) অনুপ্রবেশ করতে পারে এবং যার ফলে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ঝুঁকিতে (Risk) পড়তে পারে। এ ছাড়া ঝুঁকি বিশ্লেষণ (Risk Analysis) ও ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট (CCP) নিরুপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এই CCP এর পাশাপাশি উত্তম খামার চর্চা (GHP) প্রতিপালন করা বর্তমান সময়ে খাদ্য নিরাপদতার ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপ হিসেবে পরিচিত। সে কারনে প্রাণিসম্পদ ভ্যালু চেইন এ খাদ্য নিরাপদতার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে সকল বিপত্তি অনুপ্রবেশ করতে পারে সেই সকল ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় করণীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এই বিপত্তিসমূহ প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন, পরিবহন, বিপণনের সময় অনুবেশ করে ঝুঁকি সৃষ্টি পারে। যা প্রাণিজাত খাদ্যের নিরাপদতা নষ্ট করে এবং জনস্বাস্থ্য হুমকির কারণ হতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ (Risk Analysis):

প্রাণিসম্পদ ভ্যালু চেইনের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে হলে সম্ভাব্য বিপত্তির উৎস চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরী। একই সাথে বিপত্তির প্রভাবে ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা আনা প্রয়োজন। বিশ্ব প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থা (WOAH) মতে ঝুঁকি বিশ্লেষণের চারটি ধাপ হচ্ছে: (ক) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ (ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণিবদ্ধকরণ); (খ) ঝুঁকি বিশ্লেষণ (ঝুঁকি শুরু/প্রকাশ, বহিঃপ্রকাশ এবং ফলাফল পরিমাপ করা); (গ) ঝুঁকি নিরসণ (ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থ্যাগুলো বাছাই করা, সেগুলোর বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষন ও মূল্যায়নের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকার বিষয়গুলো নিশ্চিত করা, এবং (ঘ) উপরোক্ত তিনটি ধাপ সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় ও ঝুঁকি সম্পর্কে পর্যাপ্ত যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন (চিত্র ১)। প্রাণিসম্পদ খাদ্য বলয়ে খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত করতে ঝুঁকি বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়।



চিত্র ১: ঝুঁকি বিশ্লেষণ কাঠামো (সূত্র: বিশ্ব প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থা)

বিপত্তিসমূহ (Hazard):

জৈবিক বিপত্তি (Microbiological)	রাসায়নিক বিপত্তি (Chemical)	শারিরিক বিপত্তি (Physical)
	পোল্ট্রি	
• *Campylobacter* spp. • *Salmonella* spp. • *Escherichia coli*	• অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ • মাইকোটক্সিন (বিশেষ করে অ্যাফলাটক্সিন ও ওক্রাটক্সিন) • ডায়োক্সিন এর মতো পলিক্লোরিনেটেড বাইফেনাইলস • অরগানোফস ফরাস কমপাউন্ডস, রোডেন্টিসাইডস, রং ও লুব্রিকেন্ট • জবাইখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক, জীবানুনাশক যেমন আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, সীসা, পারদ ও ক্রোমিয়াম, ইত্যাদি।	প্রক্রিয়াজাত মুরগীর ভেতরে বিভিন্ন ক্ষতিকর বস্তু/ দ্রবাদি পাওয়া যায় যেমন: কাঁচ, তার, ধাতব ক্লিপ, নখ, কাঠ বা বাঁশের টুকরা, স্ক্রু নাট, বোল্ট, ছোট ছোট পাথর, কাঁকর, ছুরির টুকরা, ইত্যাদি।
	বিফ	
• *Campylobacter* spp. • *Salmonella* spp. • *E. coli* • Bovine tuberculosis • Anthrax	• অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ • পেস্টিসাইড রেসিডিউ • ফুড এডিটিভস/প্রিসারভেটিভস (নাইট্রেট/নাইট্রাইটস) • এলারজেনস	প্রক্রিয়াজাত মুরগীর ভেতরে বিভিন্ন ক্ষতিকর বস্তু/ দ্রবাদি পাওয়া যায় যেমন: কাঁচ, তার, ধাতব ক্লিপ, নখ,কাঠ বা বাঁশের টুকরা, স্ক্রু নাট, বোল্ট, ছোট ছোট পাথর, কাঁকর, ছুরির টুকরা ইত্যাদি।
	দুধ	
• *Salmonella* spp. • *Listeria monocytogenes* • Bovine tuberculosis • *Campylobacter* spp. • *Brucella* • *Escherichia coli*	• পেস্টিসাইড রেসিডিউ • অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ • ফুড এডিটিভস/কনটামিনেন্ট (কৃত্রিম গন্ধ এবং রং) • এলারজেনস	• ধাতব অংশ • কাঁচ বা প্লাস্টিকের অংশ • কাঠ/কাঠের অংশ • পোকামাকড় • ময়লা বা মাটি • চুল বা অন্যান্য ফাইবার

ঝুঁকি নিরসনে পদক্ষেপঃ

পোল্ট্রি ভ্যালু চেইন	বিফ ভ্যালু চেইন	মিল্ক ভ্যালু চেইন
• উত্তম খামার চর্চা অনুশীলন; • পোল্ট্রি পরিবহনে নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহন; • পোল্ট্রি বাজারজাতকরণে উত্তম চর্চা অনুশীল; • নিরাপদ পোল্ট্রি জবাই, প্রক্রিয়াজাত ও বিতরণে উত্তম ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; • মুরগি জবাইয়ের পূর্বে ও পরে মুরগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিতকরণ; • অংশিজনদের জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ পোল্ট্রি সরবরাহে ভোক্তা-পর্যায়ে চাহিদা সৃষ্টিকরণ।	• খামার পর্যায়ে উত্তম কৃষি চর্চার অনুশীলন; • গবাদিপশুকে ভেজালমুক্ত ফিড সরবরাহ; • নিয়মিত খাদ্য নমূণা ও গবাদিপশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর; • জবাইপূর্বে গবাদিশু পরিবহনে যত্নবান হতে হবে যাতে করে ধকল কম হয়; • জবাইয়ের পূর্বে ও গবাদিপশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিতে হবে এবং পরে কারকাস পরীক্ষা করে জনসাধারনের জন্য খাবারের উপযোগী কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে; • কসাইখানায় উত্তম ম্যানফ্যাকচারিং অনুশীলন নিশ্চিত করতে হবে। • অংশিজনদের জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ বিফ সরবরাহে ভোক্তা পর্যায়ে চাহিদা সৃষ্টিকরণ।	• খামার পর্যায়ে উত্তম কৃষি চর্চার অনুশীলন; • স্বাস্থ্যবান গাভী হতে দুধ দোহন করতে হবে; • দুধ দোহনকারী উত্তম স্বাস্থ্য চর্চা নিশ্চিত করতে হবে; • দুধ পরিবহনে যন্তবান হতে হবে যাতে করে ধুলা বালি দুধকে সংক্রমিত না করে বা কচুরিপানা /খড় সংযোগে দুধ পরিবহনে বিরত থাকতে হবে; • অংশিজনদের জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ দুধ সরবরাহে ভোক্তা-পর্যায়ে চাহিদা সৃষ্টিকরণ।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপণা (Risk management of food hazards):

● ঝুঁকির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপণা: ইহা বিদ্যমান ঝুঁকি ও সাক্ষ্য-প্রমাণভিত্তিক (evidence based) তথ্য এবং দেশে বিদ্যমান খাদ্য ঝুঁকির , ঝুঁকির অনুপ্রবেশের পথসমূহ , সরবরাহ চেইনের সাথে কিভাবে যুক্ত ও সংক্রমিত হতে পারে, ঝুঁকির প্রকাশের মাত্রা সম্পর্কে ধারনা দেয়। একই সাথে বিদ্যমান ও প্রয়োজনীয় ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থা এই সবই খাদ্য নিরাপদতাকে উন্নত করে একটি গ্রহনযোগ্য মাত্রায় আনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিদ্যমান আইন-বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন। প্রাণিসম্পদ (গবাদি পশুপাখি) রোগ বিস্তৃতির পরিধি এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্নতর হতে পারে। দেশে প্রাণিসম্পদে যে সব রোগের প্রার্দুভাব রয়েছে তা সার্ভিলেন্স এর আওতায় আনতে হবে এবং এই স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

● যেসব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো গ্রহনের কথা বলা হয়ে থাকে সেগুলো অবশ্যই দেশে বিদ্যমান নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত এ সেক্টরে বিদ্যমান আইন-বিধি, নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের অবস্থা, এই শিল্পসমূহের গতি-বিধি ও লক্ষ্য, সংশ্লিষ্ট ভ্যালু চেইন অর্থনীতি এবং প্রাণিসম্পদ খাতের আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবশ্যই সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তর এবং সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে হবে:

● জাতীয় পর্যায়ে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে খামারী পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ক সেবা বিশেষ করে উৎপাদন পর্যায়ে উত্তম চর্চা প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

● প্রাণিসম্পদ বিষয়ক খাদ্যসামগ্রী (দুধ, ডিম, মাংস, পোল্ট্রি) বাজার ব্যবস্থার সাথে জড়িত জনবলের আচারনগত পরিবর্তনে (পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি পালনে) ব্যবস্থা নিতে হবে;

● আর্থিক ঋনদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছোট ও মধ্যম আকারের খামারীদের যারা খাদ্য নিরাপদতায় উত্তম অনুশীলন করেন তাদেরকে প্রনোদণা হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে;

● খাদ্য নিরাপদতা একটি অংশিজনদের দায়িত্ব (Shared responsibility) বিধায় প্রাণিসম্পদ সরবরাহ চেইনের স্টেকহোল্ডার যেমনঃ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা/সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ফিড মিলার, খামারী, সংগ্রহকারী, মধ্যস্বত্বভোগী, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং বাজারের ব্যবসায়ীদের যথাযথ ভূমিকা পালন হবে।

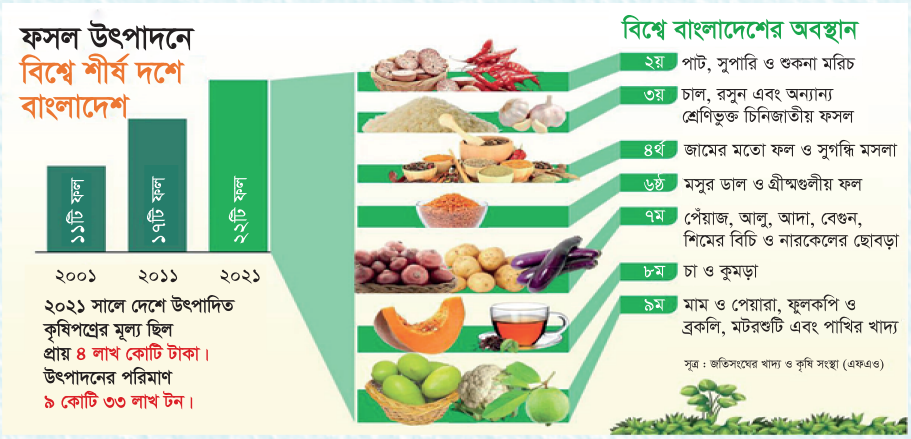
তথ্য সূত্র:

1. Chowdhury, B. & Chandra D, B. (2011). Microbiological Risk Assessment of Salmonella and Campylobacter in poultry meat.
2. Codex Alimentarius Committee (2012). Antibiotic Residue (Livestock) CAC/MRL 2-2012.
3. Islam, S.S., Akwar, H., Hossain, M. M., Sufian, M. A., Hasan, M. Z. , Chakma. S., Meeyam, T., Chaisowwong, W., Punyapornwithaya, V., Debnath, N. C., Brum, E., Pichpol, D. (2020). Qualitative risk assessment of transmission pathways of highly pathogenic avian influenza (HPAI) virus at live poultry markets in Dhaka city, Bangladesh. Zoonoses Public Health. 7(6):658-672.
4. UNIDO. (2019). The dairy and beef value chain in Bangladesh. Diagnostics, investment models and action plan for development and innovation. https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-05/Bangladesh%20dairy%20and%20beef%20vc%20report%20%28Wei%27s%20final%20version%29%20.pdf?_token=61891919
5. WOAH. (2010). Hand Book on import risk analysis for animal and animal products, 1(2), 1-88.
6. Yap, T. C. (2015a). Guidelines on improving food safety in poultry value chain in Bangladesh. Bangladesh: Department of Livestock Services (DLS) & Food and Agriculture Organization -Food. Safety Program (FAO-FSP).
7. Yap, T. C, (2015b). Manual on Ruminant Meat Inspection and Meat Hygiene. FAO-UN, Bangladesh.
8. Yap, T. C. (2015c). Manual on Ruminant Slaughterhouse Management. FAO-UN, Bangladesh
9. Yunus, M., Chowdhury, E.H., Nazneen, A. (2008). Supply Chain Analysis of Poultry in Bangladesh. A report by Academy of Educational Development, and Bangladesh Institute of Development Studies.

এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স: একবিংশ শতাব্দীতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় নতুন চ্যালেঞ্জ

প্রফেসর ড. মো. তানভীর রহমান, ডা. রনি ইবনে মাসুদ, ডিপার্টমেন্ট অব মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন, ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি সাইন্স
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২। মোবাইল: ০১৭৯৭৮৭০৬৭৮, ইমেইল: masud45891@bau.edu.bd

আমরা সকলেই খাদ্যা নিরাপত্তা কিংবা নিরাপদ খাদ্য বিষয়টির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটা সময় ছিলো, যখন দেশের মানুষ দুই বেলা পেট ভরে খেতে পারতো না, সেখানে ২০২৩ সালে দাড়িয়ে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই না, আমরা বিশ্ব দরবারেও নজির সৃষ্টি করেছি। বাংলাদেশ ২২টি কৃষিপণ্য উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে চাল, মসুর ডাল, আলু, পেঁয়াজ, চায়ের মতো পণ্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফল। গত এক দশকে কুমড়া, ফুলকপি ও সমজাতীয় সবজির মতো কিছু পণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষ তালিকায় নতুন করে যুক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয় এফএওর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছাগলের সংখ্যা, মাংস ও দুধ উৎপাদনের দিক থেকে বৈশ্বিক সূচকে ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে বাংলাদেশ ছাগলের দুধ উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়। আর ছাগলের সংখ্যা ও মাংস উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। (ছবি-প্রথম আলো)



প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, দেশে গত ১০ অর্থবছরে ডিম ও দুধ উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। আর মাংস উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণের কাছাকাছি। যেখানে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশে ডিমের উৎপাদন ছিল ১ হাজার ১৭ কোটি, তা ২০২২-২৩ অর্থবছরে এসে বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৩৩৮ কোটি। এই ১০ অর্থবছরে দুধ উৎপাদন ৬১ লাখ টন থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪১ লাখ টন। সব ধরনের মাংসের ক্ষেত্রে যা ৪৫ লাখ টন থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৭ লাখ টন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটিই প্রতিয়মান হয় যে, আমরা শুধু খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি তেমনটা না, বাংলাদেশ এখন খাদ্য রপ্তানিতেও অভূতপূর্ব সাফল্য দেখাচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম এর ভাষ্যমতে, মাংস, দুধ ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা মেটানোর পর তা দেশের বাইরে আমরা রপ্তানি করতে পারব। (ছবি-বনিক বার্তা)



বাংলাদেশ আমিষের উৎপাদন

অর্থবছর	দুধ লাখ টন	মাংস লাখ টন	ডিম কোটি পিস
২০১৮-১৯	৯৯.২৩	৭৫.১৪	১৭১১
২০১৭-১৮	৯৪.১০	৭২.৬০	১৫৫২
২০১৬-১৭	৯২.৮০	৭১.৫০	১৮৯৩
২০১৫-১৬	৭২.৭০	৬১.৫০	১১৯১
২০১৪-১৫	৬৯.৭০	৫৮.৬০	১০৯৯
২০১২-১৪	৬০.৯০	৪৫.২০	১০১৭
২০১২-১৩	৫০.৭০	৩৬.২০	৭৬২
২০১১-১২	৩৪.৬০	২৩.৩০	৭৩০
২০১০-১১	২৯.৫০	১৯.৯০	৬০৮

সূত্র : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

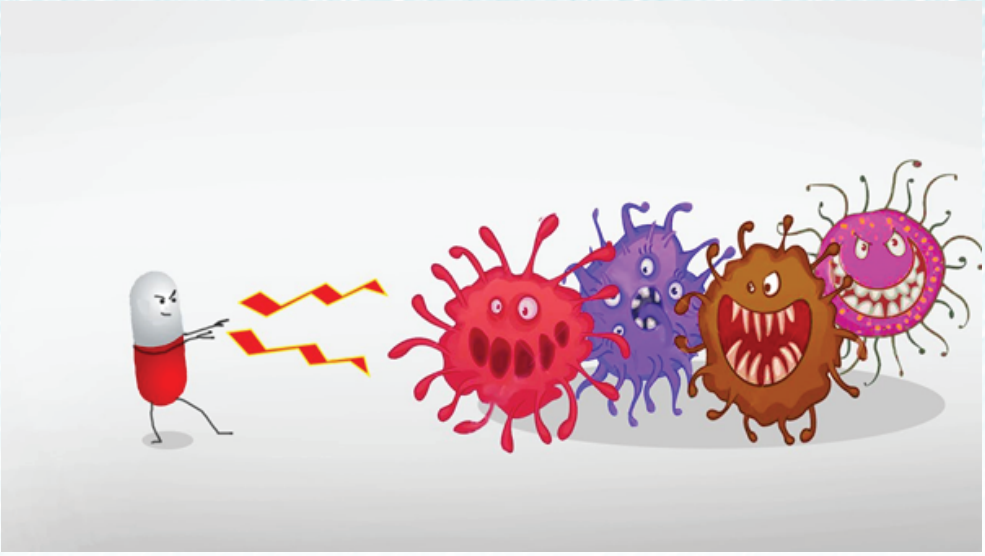
নিত্যদিনের খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের উপর আরেকটি দায়িত্ব বর্তায়। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া মানে আমরা ফুড সিকিউরিটি কে নিশ্চিত করছি। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে বিষয়টিকে আরেকটু ভালোভাবে ব্যাখ্যা করি, ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের ভিত্তিতে, ফুড সিকিউরিটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে যে, যখন সমস্ত মানুষ, সর্বদা, পর্যাপ্ত নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাবারে শারীরিক এবং অর্থনৈতিক প্রাপ্যতা থাকে যা একটি সক্রিয় এবং স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য তাদের খাদ্যের চাহিদা এবং খাদ্য পছন্দগুলি পূরণ করে।

অপরদিকে ফুড সিকিউরিটির পাশাপাশি বর্তমানে আরেকটি বিষয় নিশ্চিত করা আমাদের সবার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় সেটি হলো ফুড সেফটি। আমরা অনেক সময় ফুড সিকিউরিটি এবং ফুড সেফটি বিষয় দুটিকে এক করে ফেলি। যেহেতু দুটিরই বাংলা অর্থ দাঁড়ায় খাদ্য নিরাপত্তা বা নিরাপদ খাদ্য। কিন্তু ফুড সেফটি বলতে আসলে বোঝায়, একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যা খাদ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রস্তুতি এবং সংরক্ষণের বিশদ বর্ণনা এবং খাদ্যজনিত অসুস্থতা প্রতিরোধ করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, শুধুমাত্র ফুড সেফটি বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়ার কারনে বিশ্বে আনুমানিক ৬০০ মিলিয়ন মানুষ অর্থাৎ প্রায় ১০ জনের মধ্যে ১ জন, দূষিত খাবার খাওয়ার পরে অসুস্থ হয় পড়ে এবং প্রতি বছর ৪২০,০০০ মারা যায় এবং নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে অনিরাপদ খাদ্যের ফলে উৎপাদনশীলতা এবং চিকিৎসা ব্যয় প্রতি বছর ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়।

চলুন জেনে নেই এবার, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এর সাথে খাদ্যা নিরাপত্তার সম্পর্ক কি?

প্রথমে জেনে নেই, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কি? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স (এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিস্টেন্স/এ.এম.আর. নামেও পরিচিত) হলো এমন একটি অবস্থা যা সংগঠিত হয় কতিপয় ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিকের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য। এসব ব্যাকটেরিয়াকে বলা হয় অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া। এরা অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতিতে অভিযোজিত হয়ে যায় বলে নিজেদের স্বাভাবিক গতিতে বেড়ে উঠতে ও বংশবিস্তার করতে পারে। ফলে মানুষ বা পশুর শরীরের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসার পরও এইসব অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া রোগ সৃষ্টি করতে পারে।



এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কতটা ভয়াবহ তা কিছু তথ্য দিয়ে জানানোর চেষ্টা করি: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা - বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য শীর্ষ ১০ টি হুমকির মধ্যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সকে তালিকাভুক্ত করেছে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক অনুমান অনুসারে, ২০১৯ সালে, বিশ্বব্যাপী এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এর দরুন সংক্রমণের জন্য ১.২৭ মিলিয়ন মৃত্যুর সরাসরি দায়ী করা হয়েছিল। ২০৫০ সালের মধ্যে, বছরে ১০ মিলিয়ন পর্যন্ত মৃত্যু ঘটতে পারে। যদি এই প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তাহল এটি বার্ষিক জিডিপি থেকে ৩.৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার কমিয়ে দিতে পারে এবং পরবর্তী দশকে আরও ২৪ মিলিয়ন মানুষকে চরম দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অর্থাৎ এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা উপরোক্ত তথ্য থেকেই সকলের কাছে প্রতিয়মান হওয়ার কথা। অনেক গবেষকদের মতে, এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্ট হতে পারে আগামী দিনের করোনার মতো নতুন একটি প্যান্ডেমিক।

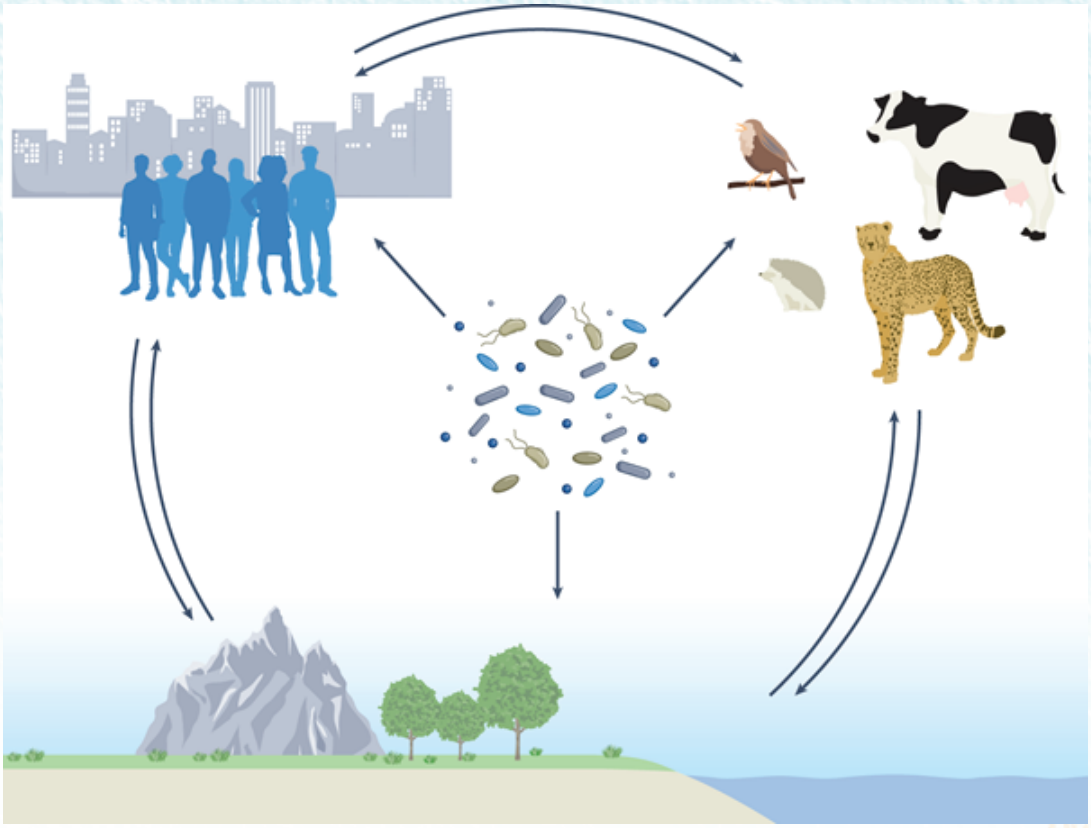
এখন প্রশ্ন হলো, খাদ্য নিরাপত্তার সাথে এন্টিবায়োটিক/এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এর সম্পর্ক কি?

তাহলে চলুন একটু বিশদভাবে আলোচনা করি। যেহেতু ইতোমধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা এবং এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স দুইটা বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়েছে, তাই এই দুইটি বিষয় নিয়ে কারো মনে কোন প্রশ্ন থাকার কথা নয়।

এখন কথা হলো, দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রানীজ আমিষের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। সেটার বাসার ডাইনিং টেবিলেই হোক, বা রেস্টুরেন্টের টেবিলেই হোক। এটি যেনো প্রত্যহিক খাদ্যা তালিকায় এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমিষ ছাড়া আমাদের শরীরের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নয়। শরীরে নানা ধরণের হরমোন, এন্টিবডি, এনজাইম ও টিস্যু তৈরি হতে আমিষের দরকার হয়। শরীরের এসিড-ক্ষার সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতেও আমিষের ভূমিকা অনেক। যখন আমরা আমিষ খাই, সেগুলি ভেঙ্গে নানা ধরণের এমিনো এসিডে পরিণত হয়। এই এমিনো এসিড থেকেই শরীর তার জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ বা প্রোটিন তৈরি করে নেয়। আর এই প্রক্রিয়ায় মাছ মাংস ডিম কিংবা দুধ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করে। এতে অবশ্যই অবদান আছে দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের সাথে সংযুক্ত সকল মানুষের। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সারাদেশে প্রতিদিন মুরগির মাংসের চাহিদা ৩০ লাখ কেজিরও বেশি। এরমধ্যে প্রায় ২০ লাখ কেজি মাংস আসে পোল্ট্রি মুরগি থেকে।

এখন খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিপণন কিংবা রান্নার সময় যদি সঠিক স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন না করি, তাহলে খাবারের মাধ্যমে এ.এম.আর. জীবাণু মানুষের শরীরে সহজেই প্রবেশ করবে, এক্ষেত্রে যদি তারা প্যাথোজেনিক হয়, তাহলে মানুষের অসুস্থতা হতে পারে, এবং সেই অসুস্থতা অ্যান্টিবায়াটিক বা অন্যান্য চিকিৎসার প্রতি সাড়া নাও দিতে পারে।

আবার অণুজীবগুলি যদি নিজেরাই প্যাথোজেনিক না হয়, তাও তারা আমাদের খাদ্য সরবরাহের মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিড়াল রেজিস্ট্যান্স জিন ট্রান্সফারে ভূমিকা রাখতে পারে। এবং খাদ্য পণ্যের ব্যাপক চলাচলের কারণে, তারা এ.এম.আর. বিস্তারে অবদান রাখতে পারে সেইসাথে অন্যান্য প্যাথোজেনিক জীবের প্রতিরোধের প্রেরণ করতে পারে।



অর্থাৎ বিষয়টি দাড়ালো, যদি আমরা খাদ্য উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি মাথায় না রাখি, তাহলে যে কোন সময় এ এম আর বাহী প্যাথোজেন মানুষের খাদ্যশৃঙ্খলে ঢুকে যেতে পারে, এবং তা ব্যপক আকারে ছড়িয়ে যেতে পারে। আর এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে একটা সময় আমরা এন্টিবায়োটিক খেলেও তা কাজে লাগবে না। অকালে মানুষের মৃত্যু হবে।

তাহলে এই সংকট মোকাবিলায় আমাদের করনীয় কি হতে পারে?

এখনো আমরা অনেকেই খাদ্যে ভেজাল মানে বুঝি ফরমালিন দেওয়া, কিংবা ইথিলিন দিয়ে ফল পাকানো। এর বাইরেও যে কত ভয়ংকর বিষয় আমাদের চোখের আড়ালে ঘটে যাচ্ছে আমরা সে ব্যাপারে মোটেও সচেতন না। তাই আমাদের সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হতে হবে এবং সবাইকে সচেতন করতে হবে। খাদ্যে এন্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্স জিনের বিস্তার রোধে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারেঃ

১. কৃষিতে দায়ীত্বশীল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবেঃ দ্রুত বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়ানোর যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা তা থেকে বেরিয়ে এসে খামারিদের শুধুমাত্র অসুস্থ পশুদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হলেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। গবাদি পশুতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে কঠোর প্রবিধান প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও এন্টিবায়োটিক এর উইথড্রোয়াল পিরিয়ড মেনে প্রানিজ পণ্য বাজারজাত করতে খামারিদের উৎসাহিত করতে হবে।

২. নজরদারি এবং পর্যবেক্ষণ বাড়াতে হবেঃ কৃষিতে অ্যান্টিমাইক্রোয়িাল ব্যবহার নিয়মিত অবলোকন করতে হবে এবং প্রতিরোধী প্যাথোজেনগুলির উত্থান সনাক্ত করতে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও নতুন কোন সংক্রমণের আবির্ভাব হলেই দ্রুত সনাক্তকরণ দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারে।

৩. অ্যান্টিবায়োটিকের বিকল্প পন্থায় খামারিদের উৎসাহিত করতে হবেঃ যেমন গবাদি পশুর জন্য ভ্যাকসিন, প্রোবায়োটিকস এবং প্রিবায়াটিকস, বিভিন্ন ঔষধি উদ্ভিদের মতো বিকল্প রোগ প্রতিরোধ ও চিকিত্সা পদ্ধতির গবেষণা ও উন্নয়নে সহায়তা করা।

৪. জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবেঃ মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন এর মাধ্যেমে জনমনে সচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং এর ঝুঁকি ও সংবেদনশীল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে ভোক্তা, কৃষক এবং খাদ্য উৎপাদকদের শিক্ষিত করতে হবে।

৫. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে হবেঃ এএমআর মোকাবেলা করার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ বিশেষজ্ঞ দল তৈরি করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং প্রতিবেশী সে দেশগুলির সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতি আরো বেশি মনোযোগ দিতে হবে। কারন এম.এম.আর. জিন দেশ, সীমান্ত কিংবা কাটা তারের উর্ধ্বে, সেটি এক দেশ থেকে আরেক দেশে সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে।

৬. গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদার করতে হবেঃ নতুন অ্যান্টিবায়োটিক বিকাশের জন্য গবেষণায় বিনিয়োগ করতে হবে যা অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি এবং বিকল্প রাস্তা খুজতে সহায়তা করবে।

৭. ওয়ান হেলথ এপ্রোচ চালু করতে হবেঃ যেহেতু উৎপাদিত প্রানীজ আমিষের বেশিরভাগ অংশের প্রহীতা মানুষই, তাই মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি প্রানীর স্বাস্থ্য এবং আশেপাশের পরিবেশের সুরক্ষার দিকে নজর দিতে হবে, এবং এক্ষেত্রে এনিম্যাল চিকিৎসক, হিউম্যান চিকিৎসক পরিবেশ বিষয়ক এক্সপার্টদের কে এক হয়ে কাজ করতে হবে।

৮. যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দিকে নজর দিতে হবেঃ পরিবেশে প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার বিস্তার রোধ করতে খামার এবং ওষুধ শিল্প থেকে অ্যান্টিবায়োটিক-দূষিত বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করতে হবে। যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরিবেশকে দূষিত করা যাবেনা।

৯. সর্বোপরি দায়ীত্বপূর্ণ ব্যবহারের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবেঃ কৃষকদের জন্য প্রণোদনা প্রদান করুন যারা দায়িত্বশীল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের অনুশীলন গ্রহণ করে, যেমন ট্যাক্স সুবিধা বা ভর্তুকি প্রদান করতে হবে। এতে আরো বেশি কৃষক বা খামারি উৎসাহিত হবে। এবং একটি সংঘবদ্ধ দল তৈরি হবে, যারা এম.এম.আর. মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মানে কাজ করবে।

পৃথিবীজুড়ে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টির এজেন্ডাকে সবসময়ই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয়েছে এবং সেই ভাবনার আলোকে প্রণীত হয়েছে হাজারো উদ্যোগ। সর্বশেষ বৈশ্বিক উদ্যোগ হিসেবে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (এসডিজি-২০১৬-২০৩০) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসডিজির ১৭টি অভিলক্ষ্যের মধ্যে এসডিজি-২ নম্বরে স্থান পেয়েছে দারিদ্র ও ক্ষুধার অবসান।। তাই চলুন, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে এগিয়ে যাই। আমরা চাইনা এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্ট এর করাল থাবা আমাদের গ্রাস করুক। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস পারে আমাদের সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিকে। পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। আগামীর পৃথিবী হোক সুন্দর, নিরাপদ।

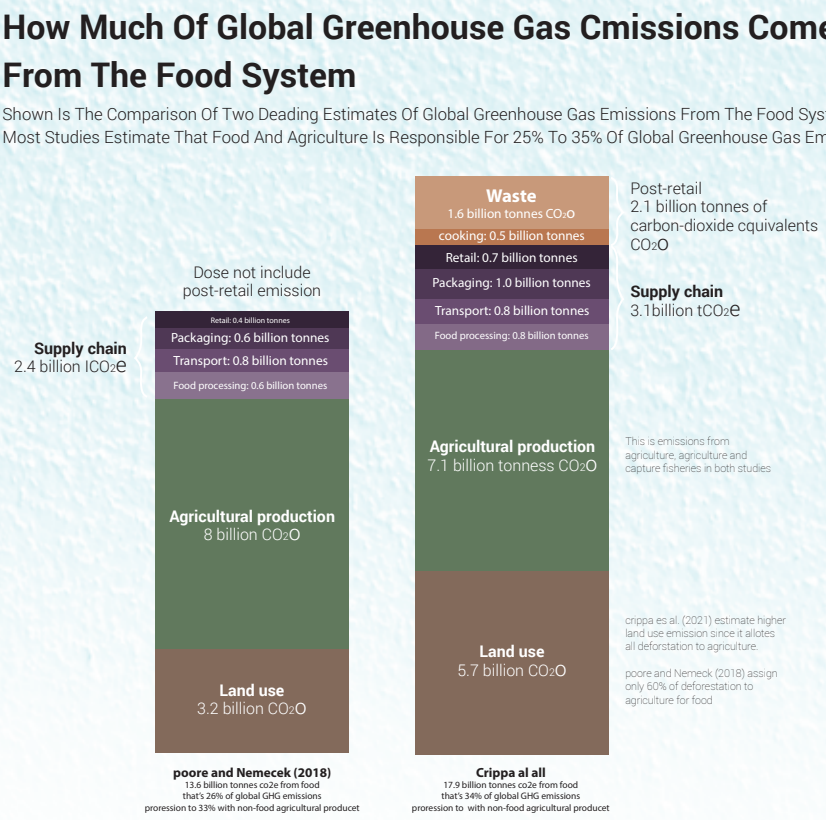
পরিবেশের উপর খাদ্য ও খাদ্যাভাসের প্রভাব

মুহতাদি মো: ওয়ালিউল্লাহ্, এমএস ফেলো (প্যাথলজি), ০১৫২১৪৮২১৮৩, ইমেল: muhtadiwaliullah@gmail.com

খাদ্য আমাদের জীবনধারণের একটি অপরিহার্য উপাদান। এটি সংস্কৃতির একটি অভিব্যক্তি, আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি এবং উদযাপন ও স্বাচ্ছন্দের একটি মাধ্যম। এজন্যই এটি আমাদের বিশেষভাবে আঘাত করে যখন আমাদের বলা হয় যে দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের খাদ্যাভাস পরিবর্তন করা উচিত। মাংসের মতো সুস্বাদু খাবার নিয়ে এ বিষয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি শুনে থাকি। তবে অন্য সকল পরিবেশগত সমস্যার মত, এই বিষয়টিও একটু জটিল। আসুন জলবায়ু পরিবর্তনে খাদ্যের প্রভাবের কিছু প্রশ্নোত্তর করা যাক।

খাদ্যের ভূমিকা জলবায়ু পরিবর্তনে কি সত্যিই এত গুরুত্বপূর্ণ?

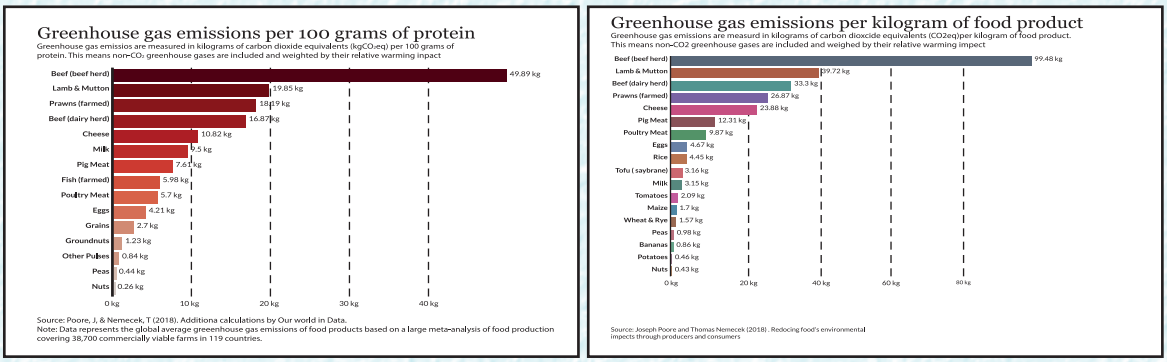
বাস্তবিক অর্থে পৃথিবীর বিলিয়ন মানুষের খাদ্যের যোগান কার্বন নিঃসরণ ছাড়া অসম্ভব। এমনকি যদি একদিন আমাদের কাছে নবায়নযোগ্য শক্তিতে চলমান ট্রাক্টর, ফ্রীজ বা কুকারও থাকে তা সত্ত্বেও কিছু কার্বন নিঃসরণ অনিবার্য। উদাহরণস্বরূপ যেমন ধান গাছ মিথেন নিঃসরণের জন্য দায়ী এবং গবাদিপশুর চারণভূমি ও ফসলের জমির জন্য আমাদের বনাঞ্চল কেটে ফেলতে হয়। আমরা চাষের জমিতে নাইট্রোজেন সার ও গোবর প্রয়োগের মাধ্যমে বাতাসে নাইট্রাস অক্সাইড নিঃসরণ করি।



চিত্র ১: ২০২১ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায় পৃথিবীব্যাপী শুধু খাদ্যের উৎপাদন প্রায় ৭ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড নি:সরণ করে।

আজ বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন, মোট মানবঘটিত গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমনের প্রায় ২৬ শতাংশ দায়ী। এর মধ্যে কৃষিক্ষেত্র ২৭%, মৎস্য ও প্রাণী খাত ৩১%,খাদ্য সরবরাহ ১৮% এবং জমির ব্যবহার ২৪% দায়ী। অন্যভাবে বললে আজ আমরা যদি অন্যান্য সমস্ত গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন উৎসকে নির্মূল করি ,শুধুমাত্র খাদ্যসৃষ্ট নিঃসরণ আমাদের ২১০০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ থেকে ২ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট। সুতরাং,আমরা যেভাবেই চিন্তা করিনা কেন, খাদ্য জলবায়ু পরিবর্তনের একটি বাস্তব চালক। যা এক প্রকার দুর্ভাগ্যজনক কেন না খাবার আমাদের জন্য ঐচ্ছিক নয়।

তবে সকল ধরনের খাবারের প্রভাব নিশ্চয়ই সমান নন। খাবারের জলবায়ুগত প্রভাব এর 'জীবনচক্র মূল্যায়ন' এর মাধ্যমে হয়ে থাকে যা এর অস্তিত্বের পুরো সময়ের (উৎপাদন, প্যাকেজিং, পরিবহন, ব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) একটি বিশ্লেষণ । এ বিষয়ে একটি বিশদ গবেষণায় গরুর মাংসের কার্বন নিঃসরণ শীর্ষে উঠে এসেছে।



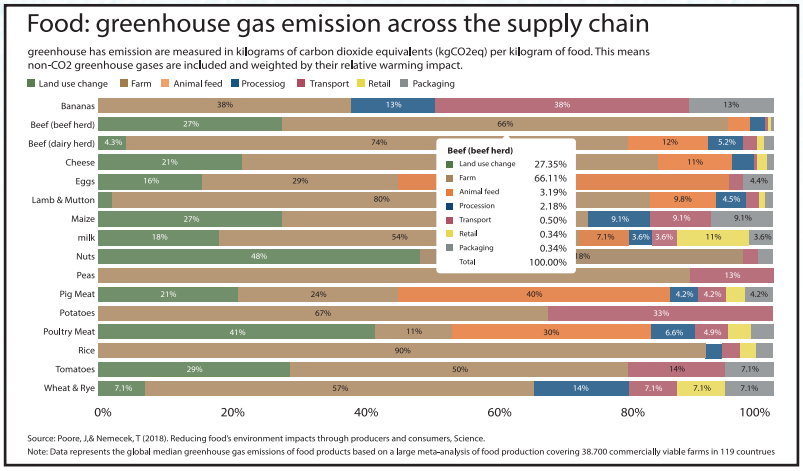
চিত্র ২: বিভিন্ন খাদ্যের কার্বন নি:সরণের তালিকা (খাদ্যের ওজন এবং পুষ্টিগুনের ভিত্তিতে)।

প্রতি কেজি গরুর মাংস প্রায় ১০০ কেজি কার্বন-ডাই-অক্সাইড সমতুল্য নির্গমন করে। ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ৪০ কেজি এবং কেজিপ্রতি পোল্ট্রির মাংস ১০ কেজি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করে। তবে এই তালিকার নিচের দিকে আমরা অনেকগুলি উদ্ভিজ্জ খাবার পাই। উদাহরণস্বরূপ আলু, গরুর মাংসের চেয়ে ১৫০ গুণ কম কার্বন নির্গত করে। তবে খাবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এর ওজন নয়, এর পুষ্টিগুণ। এক কেজি গরুর মাংস আপনাকে ১ কেজি আলুর চাইতে অনেক বেশি সময় বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তাই যদি আমরা ক্যালরি এবং প্রোটিনের ভিত্তিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের তুলনা করি, তবে এই তালিকা কিভাবে পরিবর্তিত হয় ? সত্যি বলতে খুব বেশি নয়। প্রাণিজ প্রোটিন এখনো পরিবেশের জন্য সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং তার মধ্যে গরু ও ছাগলের মাংস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তবে এক্ষেত্রেও সব গরু বা ছাগলের মাংস এক নয়। কেননা গবাদি পশু পালনেরও বিভিন্ন উপায় রয়েছে। এর মধ্যে পরিবেশের জন্য সবচেয়ে ব্যয়বহুল গরুর মাংস ১০০ গ্রাম প্রোটিনে ১০৫ কেজি কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন করে যা সর্বনিম্নের ক্ষেত্রে মাত্র ৯ কেজি। পার্থক্য এখানে প্রায় ১০ গুণ! তবে উদ্ভিজ্জ খাবারের নিঃসরণ এর উভয় হতেই উল্লেখযোগ্যভাবে কম। উদাহরণস্বরূপ উচ্চপ্রোটিন বিশিষ্ট উদ্ভিজ্জ খাবারগুলোর মধ্যে তোফু প্রতি ১০০ গ্রাম প্রোটিনে ১.৫-৩.৫ কেজি এবং বিভিন্ন খাদ্যশস্য ১-৪.৬ কেজি নিঃসরণ করে।

এখন প্রশ্ন জাগে আমরা সঠিক গরুর মাংস কিনে আমাদের নিঃসরণ কমাতে পারি কিনা? হয়তো স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত খাদ্য কিনে আমাদের কার্বন নিঃসরণ সর্বনিম্ন করা সম্ভব ।পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় খাদ্য কেনা আসলেই কি গুরুত্বপূর্ণ?

চলুন গরুর মাংসের কথাই ধরা যাক। স্থানীয় গরুর মাংস কেনাকাটা করে আপনি পরিবহন ও প্যাকেজিং থেকে নির্গমন কমাতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু গরুর মাংসের ক্ষেত্রে পরিবহনের জন্য নিঃসরণ ঘটে মাত্র ০.৫ থেকে ১% । প্যাকেজিংসহ যা মাত্র ১১% । উপরন্তু খাদ্য পরিবহনজনিত নিঃসরণ মূলত স্থানীয় স্থল পরিবহনের মাধ্যমে হয়ে থাকে ,আন্তর্জাতিক পরিবহন বেশিরভাগ মালবাহী জাহাজে হয় যা প্রায় ৯৫ শতাংশ কার্বন সাশ্রয়ী। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি পরিবহন বড় ভূমিকা পালন না করে তবে এ নির্গমনের কারন কি?



চিত্র ৩: খাদ্যের জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপে কার্বন নিঃসরণ।

কোন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানও এ বিষয়ে প্রভাব ফেলে কেননা এটি নির্ধারণ করে সেখানে কোন চাষ পদ্ধতি সম্ভব। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো বনাঞ্চলকে চাষের জমিতে পরিণত করা। এটি শুধুমাত্র উদ্ভিদে আবদ্ধ কার্বনকেই মুক্ত করে না, সেইসাথে মাটিতে আবদ্ধ কার্বনকেও মুক্ত করে দেয় এবং ভবিষ্যতে তা সঞ্চয় করার ক্ষমতা ধ্বংস করে। এই দিকটি গরুর মাংস সহ অন্যান্য সকল খাদ্যের কার্বন নিঃসরণের একটি বড় কারণ।

এখানে একটি ভয়ংকর সত্য লুকিয়ে আছে। পশুরা যত কষ্ট পায় ততই তারা জলবায়ুর জন্য মঙ্গলজনক। তারা কম জমি ব্যবহার করে এবং তাদের খাবার তাদের কাছেই আনা হয়; তারা হাঁটাচলায় শক্তি ব্যয় করে না এবং এজন্যে তারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। একটি ফার্মের পশু যা কখনোই চারণ ভূমিতে ঘুরে বেড়াতে পারে না, কখনো কখনো জলবায়ুর জন্য সবুজ অরণ্যে শান্তভাবে চড়ে বেড়ানো পশুর চেয়ে কম ধ্বংসাত্মক।

তবে চারণভূমি ব্যবহারের জন্য আমরা গবাদিপশুকে কি এতটাই দোষ দিতে পারি? গবাদিপশু কি মূলত এমন জমি ব্যবহার করে না যা আমাদের কৃষি বা অন্যক্ষেত্রের জন্য অব্যবহারযোগ্য? পশুপালন কি এই অব্যবহৃত সম্পদকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহারের একটি বুদ্ধিমান উপায় নয়?

মূলত বিশ্বব্যাপী মাত্র ১৩% গরু চারণভূমিতে পালিত হয় এবং এক্ষেত্রেও শুধু চারণভূমি কোন প্রাণীর জন্য যথেষ্ট নয়। আমরা যদি শুধু চারণভূমির উপর নির্ভর করে গবাদিপশু চাষ করতে চাই, তবে এর উৎপাদন প্রায় ৭০% হ্রাস পাবে। সুতরাং চাহিদা মেটানোর একমাত্র উপায় হল ফসল চাষ করে তা গবাদিপশুকে খাওয়ানো। পোল্ট্রির ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আরো প্রকট যেহেতু তারা কেবলমাত্র খাদ্যশস্যের উপর নির্ভরশীল। প্রাণিখাদ্যের এই বিশাল চাহিদার জন্য ,উৎপাদিত খাদ্যশস্যের অর্ধেকেরও কম সরাসরি মানবখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং প্রায় ৪১ শতাংশ পশুদের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর একটি উদাহরণ দেখা যাক। আমাজন বন উজাড়ের জন্য সয়াবিন উৎপাদনের কথা আমরা প্রায় শুনে থাকি, কিন্তু বিশ্বব্যাপী মাত্র ১৯ শতাংশ সয়াবিন মানব খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এর ৭৭ শতাংশই যায় পশুখাদ্যে। এছাড়াও যেসব জমি ফসলের জন্য অনুপযুক্ত,তা পরিবেশগত ভাবে অকেজো নয়। আমাদের খাদ্যতালিকা থেকে যদি শুধুমাত্র গরুর মাংস বাদ দেয়া হয় তবে তা পৃথিবীব্যাপী এমন ২ বিলিয়ন হেক্টর জমি মুক্ত করবে যা আমরা বনায়নের জন্য ব্যবহার করতে পারি। এটি আগামি ১০০ বছরে প্রায় ৫৫০ বিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড অপসারণ করতে পারে যেখানে বর্তমানে আমরা বছরে সর্বমোট প্রায় ৫০ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ করি।

পরিশেষে খাদ্য কার্বন নির্গমনের একটি বিশাল চালক। মাংস বিশেষ করে গরুর মাংস নির্গমনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। খাদ্য স্থানীয়ভাবে কেনার তুলনায় আমাদের খাদ্যাভাস কার্বন নির্গমনের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ুর বিবেচনায় চারণভূমির পশু কখনও অপ্রয়োজনীয় হতে পারে কারণ তাদের পালনে অধিক জমির প্রয়োজন। এখন এই বিষয়গুলোর পাশাপাশি প্রানিজ আমিষও আমাদের জন্য অতিব গুরুত্বপুর্ণ একটি খাদ্য উপাদান। পরিবেশ রক্ষায় আমাদের সর্বপ্রথম উদ্যোগ হওয়া উচিত খাদ্য অপচয় রোধ করা। আজ বিশ্বের উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় অর্ধেক আমরা অপচয় করি যা একদিক থেকে যেমন উৎপাদন ও সরবরাহে পরিবেশে কার্বন নির্গত করে তেমনি বর্জ্য হিসেবেও তা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। খাদ্যের অপচয় রোধের পাশাপাশি আমাদের এখন অধিকতর গবেষণার প্রয়োজন যার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতে পরিবেশকে সুস্থ রেখে এ পৃথিবীর বিলিয়ন মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করতে পারি। এর মধ্যে কম মিথেন নি:সরণকারি গবাদিপশুর জাত উদ্ভাবন এবং পরিবেশবান্ধব রেশন প্রস্তুত উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রানিজ আমিষের বিকল্প হিসেবে রিকম্বিন্যান্ট ব্যাকটেরিয়া দ্বারা প্রস্তুতকৃত মাংস হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আমাদের প্লেটে জায়গা নেবে। এসবের পাশাপাশি আমাদের খাদ্যাভাস পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ কিনা সেটিও আমাদেরও নজরে রাখতে হবে।আমাদের বিশ্ব যখন খাদ্য নিরাপত্তার দিকে ছুটছে, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তা নিশ্চয়তার পাশাপাশি আমরা যেন আমাদের পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিও নজরে রাখি। দিনশেষে স্বাস্থ্যকর খাবার এবং সুস্থ পরিবেশ উভয়েই আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য।

সূত্রঃ

-https://ourworldindata.org/food-emissions-carbon-budget
-https://science.sciencemag.org/content/344/6188/1109?ijkey=efa2a968694e64246748671ef9a1d80e95f9ad83&keytype2=tf_ipsecsha
-https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987
-https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food
-http://www.fao.org/3/X9892E/X9892e05.htm#P8217_125315
-http://www.fao.org/3/X9892E/X9892e05.htm#P8217_125315
-https://ourworldindata.org/explorers/food-footprints?country=Beef+%28beef+herd%29~Lamb+%26+Mutton~Beef+%28dairy+herd%29~Prawns+%28farmed%29~Cheese~Pig+Meat~Poultry+Meat~Eggs~Rice~Tofu+%28soybeans%29~Milk~Tomatoes~Maize~Wheat+%26+Rye~Peas~Bananas~Potatoes~Nuts&Environmental+impact=Carbon+footprint&Metric=Per+100+grams+of+protein&By+stage+of+supply+chain=false
-https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987
-https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food#less-meat-is-nearly-always-better-for-your-carbon-footprint-than-sustainable-meat
-https://ourworldindata.org/explorers/food-footprints?stackMode=relative&country=Beef+%28beef+herd%29~Lamb+%26+Mutton~Beef+%28dairy+herd%29~Prawns+%28farmed%29~Cheese~Pig+Meat~Poultry+Meat~Eggs~Rice~Tofu+%28soybeans%29~Milk~Tomatoes~Maize~Wheat+%26+Rye~Peas~Bananas~Potatoes~Nuts&Environmental+impact=Carbon+footprint&Metric=Per+kilogram&By+stage+of+supply+chain=true
-https://ourworldindata.org/food-ghg-emissions
-https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food#whether-food-travels-by-sea-or-air-makes-all-the-difference
-https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local#avoid-the-small-share-of-foods-that-are-air-freighted
-https://hortintl.cals.ncsu.edu/sites/default/files/documents/2017octoberexportingfreshavocadostoeurope.pdf
-https://www.searates.com/services/distances-time/
-https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987
-https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29856664/
-https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food
-https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/fcrn_gnc_report.pdf
-https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aad401
-https://ourworldindata.org/land-use-diets#less-than-half-of-the-world-s-cereals-are-fed-directly-to-humans
-https://www.tabledebates.org/building-blocks/soy-food-feed-and-land-use-change

ওয়ান হেলথ ও খাদ্য নিরাপত্তা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

প্রফেসর ড মো. মাহমুদুল হাসান শিকদার, জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা- ওয়ান হেলথ, FAO ECTAD, বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ওয়ান হেলথ মানুষ, পশু, আর পরিবেশের জন্য সেরা স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার একটা সম্মিলিত, বিভিন্ন শাস্ত্রের সমন্বয়ে গড়া পদ্ধতি। এটা মানুষ, পশু, আর পরিবেশের স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক আছে, আর রোগ একটা থেকে অন্যটায় ছড়াতে পারে, সেটা বুঝতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তা ওয়ান হেলথের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ খাদ্যবাহিত রোগ সবার স্বাস্থ্যের উপর বাজে প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশ একটা ঘনবসতিপূর্ণ দেশ যেখানে খাদ্যবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২২ লাখ মানুষ খাদ্যবাহিত আর পানিবাহিত ডায়রিয়ায় মারা যায়। খাদ্যবাহিত রোগ বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও বাজে প্রভাব ফেলে, দেশের প্রতি বছর প্রায় ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতি করে।

ওয়ান হেলথ নিয়ে বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে বেশ উৎসাহ বাড়ছে। ২০১৭ সালে, বাংলাদেশ সরকার "বাংলাদেশে এক স্বাস্থ্য পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য কৌশলগত কাঠামো ও কর্মপরিকল্পনা (২০১৭-২০২১)" গ্রহণ করে। এই কাঠামোটি বাংলাদেশে এক স্বাস্থ্যের জন্য কয়েকটি মূল অগ্রাধিকার বর্ণনা করে, যার মধ্যে রয়েছে:

১. মানুষের স্বাস্থ্য, প্রাণীর স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ স্বাস্থ্য পেশাদারদের মধ্যে সহযোগিতা ও যোগাযোগ জোরদার করা;
২. জুনোটিক রোগ এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ (AMR) মতো এক স্বাস্থ্য বিষয়গুলিতে গবেষণা পরিচালনা করা;
৩. এক স্বাস্থ্য-ভিত্তিক নীতিমালা ও কর্মসূচি বিকাশ ও বাস্তবায়ন করা;
৪. জনসাধারণ এবং সংশ্লিষ্টদের মধ্যে এক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

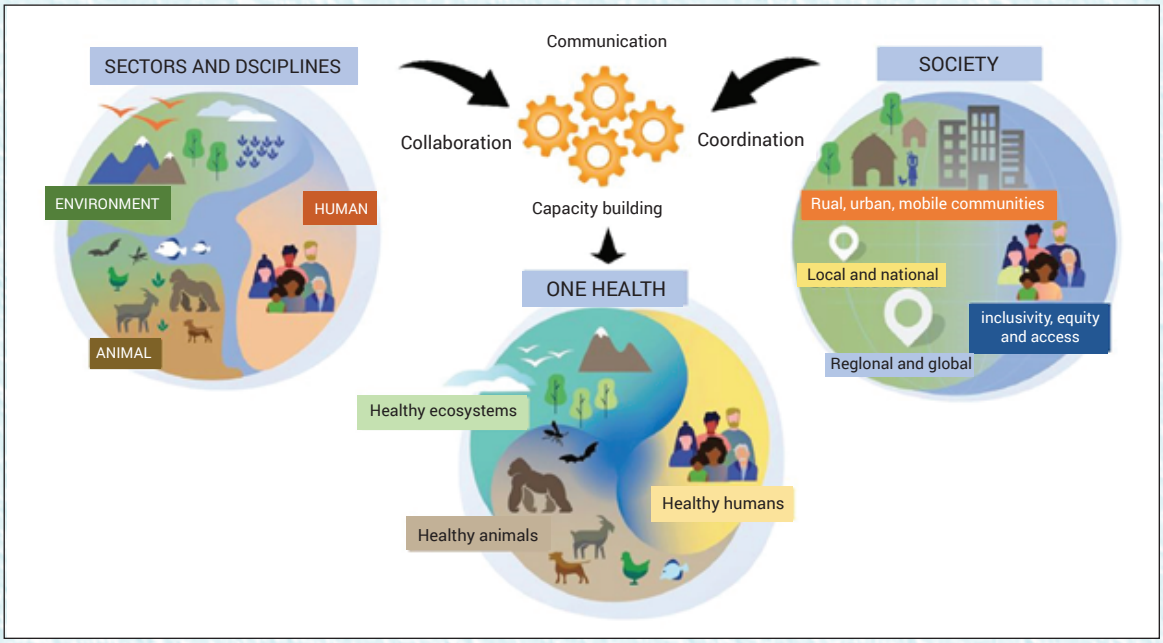
বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ওয়ান হেলথ উদ্যোগ চলছে, যেমন:

- বাংলাদেশ ওয়ান হেলথ প্যাটফর্ম: এটি একটি মাল্টি-স্টেকহোল্ডার প্যাটফর্ম যেখানে মানুষের স্বাস্থ্য, পশুর স্বাস্থ্য, পরিবেশ স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য খাত থেকে প্রতিনিধিদের একসঙ্গে আনা হয় ওয়ান হেলথ বিষয়গুলিতে সহযোগিতা করার জন্য।
- ওয়ান হেলথ জুনোসিস সেন্টার: ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ (আইইডিসিআর)-এ অবস্থিত এই কেন্দ্রটি জুনোটিক রোগ নিয়ে ওয়ান হেলথ গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্র।
- ওয়ান হেলথ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ (AMR) প্রোগ্রাম: এটি একটি মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম যার লক্ষ্য বাংলাদেশে AMR সমস্যার মোকাবেলা করা।
- Bangladesh AMR Responses Alliances (BARA): এই প্রোগ্রামটি FAO দ্বারা শুরু হয়েছিল যেখানে AMR মোকাবেলা করতে এবং অ্যান্টিবায়োটিকের দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মানব ও প্রাণী স্বাস্থ্যের নির্দেশনা একত্রিত হয়।
- Bangladesh One Health Pedagogy Forum: এখানে শিক্ষকরা একত্রিত হন এবং ওয়ান হেলথের উপর প্রশিক্ষণ পান।

এই উদ্যোগগুলির পাশাপাশি, বাংলাদেশ সরকারও তার জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নীতি এবং খাদ্য নিরাপত্তা আইন, ২০১৩-এর মাধ্যমে ওয়ান হেলথ পদ্ধতি শক্তিশালী করতে কাজ করছে। এই নীতিমালা ও আইনগুলি বিভিন্ন খাতের মধ্যে সহযোগিতার জন্য একটি কাঠামো সরবরাহ করে খাদ্য সরবরাহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য।

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দেশের খাদ্য সরবরাহ চেইন জটিল এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, যার ফলে সব পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন। বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার কিছু প্রধান চ্যালেঞ্জ হল:

১. খাদ্য পরিচালনাকারী এবং ভোক্তাদের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব;
২. খাদ্য সরবরাহ চেইনে অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন;
৩. অপ্রতুল খাদ্য নিরাপত্তা বিধিমালা এবং তা বাস্তবায়ন;
৪. নিরাপদ খাদ্যের অভাব, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্বলদের জন্য।



চিত্র: ওয়ান হেলথ এবং এর সংযোগ (One Health High Level Expert Panel সংজ্ঞা অনুযায়ী)

বাংলাদেশ সরকার, তার উন্নয়ন অংশীদারদের সহযোগিতায়, এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা এবং দেশে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এইগুলির মধ্যে রয়েছে:

- শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণ এবং সংশ্লিষ্টদের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো;
- খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা এবং তা বাস্তবায়ন জোরদার করা;
- খাদ্য সরবরাহ চেইনের সব পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য অবকাঠামো এবং সরঞ্জামে বিনিয়োগ করা;
- ছোট পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারীদের খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

ওয়ান হেলথ এবং খাদ্য নিরাপত্তা: বাংলাদেশের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ

ওয়ান হেলথ পদ্ধতি বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু সুযোগ সৃষ্টি করে। মানুষ, পশু এবং পরিবেশের স্বাস্থ্য পেশাদাররা একসঙ্গে কাজ করে খাদ্যজনিত রোগগুলিকে আরও ভালভাবে শনাক্ত করতে, প্রতিরোধ করতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ওয়ান হেলথ নিম্নলিখিতভাবে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে:

১. খাদ্য দূষণের ঝুঁকি কমায় এমন টেকসই কৃষি পদ্ধতি প্রচার করা;
২. খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা জোরদার করা;
৩. খাদ্য পরিচালনাকারী এবং ভোক্তাদের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো।

যাই হোক, বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ওয়ান হেলথ পদ্ধতি বাস্তবায়নেও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই চ্যালেঞ্জগুলি হল:

১. সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ওয়ান হেলথ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব;
২. ওয়ান হেলথ উদ্যোগের জন্য সীমিত সম্পদ;
৩. বিভিন্ন খাতের মধ্যে সহযোগিতার অভাব;
৪. জটিল এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খাদ্য সরবরাহ চেইন।

ওয়ান হেলথ খাদ্য নিরাপত্তা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ওয়ান হেলথ পদ্ধতি বাস্তবায়নে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলি মোকাবেলা করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হচ্ছে:

১. সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ওয়ান হেলথ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো: এটি মানুষের স্বাস্থ্য, পশুর স্বাস্থ্য, পরিবেশের স্বাস্থ্য পেশাদার, খাদ্য পরিচালনাকারী এবং ভোক্তাদের জন্য শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে করা যেতে পারে।

২. বিভিন্ন খাতের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা: এটি ওয়ান হেলথ প্ল্যাটফর্ম এবং কমিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, এবং ওয়ান হেলথ-ভিত্তিক নীতিমালা ও কর্মসূচি বিকাশ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

৩. ওয়ান হেলথ উদ্যোগের জন্য সম্পদ বাড়ানো: এটি সরকার এবং তার উন্নয়ন অংশীদারদের দ্বারা, পাশাপাশি বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

৪. জটিল এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খাদ্য সরবরাহ চেইনের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করা: এটি সরবরাহ চেইনের সব পর্যায়ে ওয়ান হেলথ-ভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তা মানদন্ড এবং নির্দেশিকা বিকাশ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে খাদ্যজনিত রোগের অর্থনৈতিক প্রভাব

বাংলাদেশের জন্য খাদ্যজনিত রোগের ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে। মানুষের ক্ষতি পরিমাপ করা না গেলেও, খাদ্যজনিত রোগের আর্থিক খরচ বেশ্যাধিক। আসুন বাংলাদেশে খাদ্যজনিত রোগের অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানি।

বাংলাদেশে খাদ্যজনিত রোগের অর্থনৈতিক প্রভাব

বাংলাদেশের জন্য খাদ্যজনিত রোগের ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে। মানুষের ক্ষতি পরিমাপ করা না গেলেও, খাদ্যজনিত রোগের আর্থিক খরচ বেশ্যাধিক। আসুন বাংলাদেশে খাদ্যজনিত রোগের অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানি।

১. **প্রত্যক্ষ স্বাস্থ্যসেবা খরচ:** খাদ্যজনিত রোগ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করে। রোগীদের চিকিৎসা, হাসপাতালে ভর্তি এবং ওষুধের প্রয়োজন হয়। খাদ্যজনিত রোগ চিকিৎসার খরচ ইতিমধ্যে চাপে থাকা স্বাস্থ্যসেবা বাজেটে যোগ করে।

২. **উৎপাদনশীলতা হারানো:** খাদ্যজনিত রোগ কর্মক্ষেত্র থেকে অনুপস্থিতি বাড়ায়, যা শ্রম উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে। এটি ব্যক্তি এবং ব্যবসা উভয়ের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষতি করে। এমন একটি দেশে যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ দৈনিক মজুরির উপর নির্ভর করে, প্রভাবটি বিশেষভাবে তীব্র।

৩. **কৃষি ক্ষতি:** খাদ্যজনিত রোগ কৃষি খাতের উপর বিধ্বংসী প্রভাব ফেলতে পারে। দূষিত পণ্য প্রায়ই ধ্বংস করতে হয়, যার ফলে কৃষকদের আর্থিক ক্ষতি হয়। উপরন্তু, নির্দিষ্ট খাদ্য পণ্যের প্রতি ভোক্তাদের আস্থা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে কৃষি বিক্রয়কে প্রভাবিত করে।

৪. **পর্যটন প্রভাব:** বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বাড়ছে, তবে খাদ্য নিরাপত্তা উদ্বেগ পর্যটকদের নিরুৎসাহিত করতে পারে। দর্শকদের মধ্যে খাদ্যজনিত রোগের খবর নেতিবাচক প্রচার এবং পর্যটনের হ্রাস ঘটতে পারে, যা রাজস্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৫. **মানব সম্পদের ক্ষতি:** খাদ্যজনিত রোগের ফলে অকাল মৃত্যু এবং অক্ষমতা সামগ্রিক কর্মশক্তির উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। মানব সম্পদের এই ক্ষতির দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিণতি রয়েছে।

৬. **খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার খরচ:** সরকার এবং খাদ্য শিল্পকে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং অবকাঠামো উন্নয়নসহ খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করতে হবে। এই খরচগুলি ভোক্তাদের কাছে পাঠানো হয়, যার ফলে খাবারের দাম বাড়তে পারে।

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিধিমালা

খাদ্য নিরাপত্তার গুরুত্ব বুঝতে পেরে বাংলাদেশ তার খাদ্য সরবরাহ চেইন নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশে খাদ্য নিরাপত্তার মূল বিধিমালা এবং সংস্থাগুলি হল:

- **খাদ্য নিরাপত্তা আইন ২০১৩:** খাদ্য নিরাপত্তা আইন, ২০১৩ হল বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিচালনার জন্য একটি সামগ্রিক আইন। এটি খাদ্য উৎপাদন, পরিচালনা এবং বিতরণের সব দিককেই আচ্ছাদিত করে। আইনটি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) প্রতিষ্ঠা করে।

- **বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ):** বিএফএসএ হল বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিধিমালা তদারকি ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রাথমিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এটি খাদ্য নিরাপত্তার মান নির্ধারণ করে, পরিদর্শন করে এবং লঙ্ঘন ঘটলে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- **জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নীতি:** জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নীতি বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য একটি কৌশলগত কাঠামো প্রদান করে। এটি খাদ্য সরবরাহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির রূপরেখা দেয়।
- **খাদ্য নিরাপত্তার মান:** বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য নিরাপত্তার মান গ্রহণ করেছে। এই মানগুলি কৃষি উৎপাদন থেকে খাদ্য প্যাকেজিং পর্যন্ত বিস্তৃত খাদ্য পণ্য এবং প্রক্রিয়াকে আচ্ছাদিত করে।
- **খাদ্য নিরাপত্তা পরীক্ষা:** বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা পরীক্ষার জন্য গবেষণাগার স্থাপন করেছে, যা বাজারে খাদ্য পণ্যের গুণমান এবং নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নের অর্থনৈতিক প্রভাব

উপরের কেস স্টাডিগুলি বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সুবিধাগুলির চিত্র তুলে ধরে। এই সুবিধাগুলি স্বাস্থ্যসেবা খরচ কমাতে এবং ভোক্তাদের আস্থা বাড়ানোর বাইরেও বিস্তৃত। উন্নত খাদ্য নিরাপত্তা:

- **রপ্তানি বাড়ানো:** আন্তর্জাতিক খাদ্য নিরাপত্তা মান পূরণ করলে বাংলাদেশী খাদ্য পণ্যের রপ্তানি সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অবদান রাখে।
- **পর্যটন বৃদ্ধি:** নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য সুনাম একটি দেশে আরও পর্যটক আকর্ষণ করতে পারে, যা আতিথেয়তা এবং পর্যটন খাতকে উপকারিতা করে।
- **কৃষি ব্যবসায়কে সমর্থন করা:** খাদ্য নিরাপত্তা উদ্যোগগুলি কৃষি ব্যবসায় এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে বিনিয়োগকে উদ্দীপিত করতে পারে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বাড়ায়।
- **স্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করা:** খাদ্যজনিত রোগ কমিয়ে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যকর এবং আরও উৎপাদনশীল কর্মশক্তি বজায় রাখতে পারে, যা স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

উপসংহার

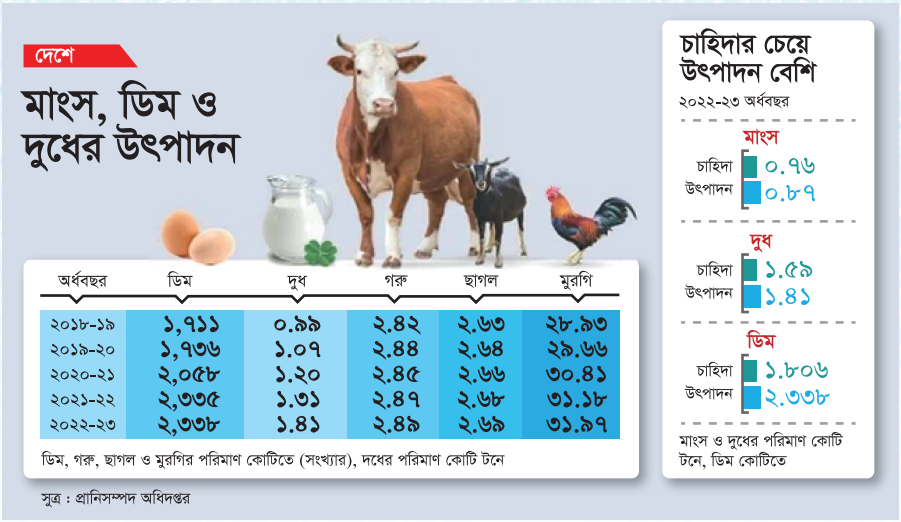
খাদ্য নিরাপত্তা বাংলাদেশে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জনস্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির জন্য এর প্রভাব বিবেচনা করে। ওয়ান হেলথ পদ্ধতি, যা মানব স্বাস্থ্য, পশু স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে স্বীকৃতি দেয়, খাদ্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলার জন্য একটি সামগ্রিক কাঠামো প্রদান করে।

বাংলাদেশ বিধিবিধি, সচেতনতা অভিযান এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও এখনও অনেক কাজ করার আছে। সচেতনতা বাড়ানো, সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা অবকাঠামোয় বিনিয়োগ করা অব্যাহত রাখা জরুরি। খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি উল্লেখযোগ্য, যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবায় খরচ কমে যাওয়া, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ। খাদ্য নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে, বাংলাদেশ তার জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে পারে, যা সবার জন্যই একটি জয়-জয় প্রস্তাব। উপসংহারে বলা যায়, বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির পথটি অগ্রগতির পথ, যা দেশের স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য লভ্যাংশ অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। এটি একটি যাত্রা যা সকল বাংলাদেশীদের জন্য নিরাপদ এবং আরও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে অব্যাহত প্রতিশ্রুতি, সহযোগিতা এবং উদ্ভাবন প্রয়োজন।

খাদ্য সংরক্ষণে ও সঠিক পুষ্টিগুণ রক্ষার্থে টেকসই প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার

ডা. সাদিয়া তাসনিম, ডিপার্টমেন্ট অব প্যাথলজি, ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি সাইন্স, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২
মোবাইল: ০১৭৭৫২৫৬১৪১, ইমেইল: sadia44282@bau.edu.bd

পাঁচটি মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা এর মধ্যে প্রথমেই উঠে আসে যে চাহিদাটি তা হলো খাদ্য। মানব জীবনের শরীরের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এই খাদ্য। তবে বিশ্বে এমন বিপুল সংখ্যক মানুষ আছেন যারা প্রতিদিন পর্যাপ্ত খাবার পান না। যদিও অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং প্রতিটি মানুষের স্বাস্থকর খাদ্যের চাহিদা মেটানোর প্রচেষ্টা বিশ্বের প্রায় সব দেশেই সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে করা হয়। কিন্তু তারপরও বিভিন্ন কারনে বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রয়োজনীয় পরিমানে খাবারের যোগান নেই। প্রত্যেক ক্ষুধার্ত ও অভাবী ব্যাক্তিকে স্বাস্থকর খাবার পেতে, খাদ্যের অপচয় কমাতে এবং খাদ্য উৎপাদন ও কৃষিকে বৃহৎ ও ছোট পরিসরে উন্নত করতে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা ও কর্মকান্ড প্রচারের জন্য প্রতি বছর ১৬ অক্টোবর তারিখে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয়। এই দিনটি পালনের উদ্দেশ্য শুধু প্রতিটি মানুষের জন্য খাদ্যের সহজলভ্যতার জন্য প্রচেষ্টা করা নয়, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যকর খাবার সরবরাহ একটি বৈশ্বিক সমস্যা যার মুখোমুখি বিশ্বের অনেক দেশ। অধিক জনসংখ্যার দেশ এই বাংলাদেশে একসময় খাদ্যে ঘাটতি, এমনকি দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও এই একুশ শতকে এসে আমরা বলতে পারি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ আমাদের এই বাংলাদেশ। সময় নিউজ এর প্রতিবেদনে দেখা যায় যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্যে ঘাটতির অবস্থা একসময় থেকে থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেন এবং দেশে এখন খাদ্য মজুত আছে ১৯ লাখ মেট্রিক টন। কিন্তু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেও কি আমরা নিরাপদ খাদ্য মানুষকে সরবরাহ করতে পারছি? আমরা কি পারছি আমাদের উৎপাদিত পন্য সঠিক ভাবে সংরক্ষন করে ভোক্তার কাছে পৌছে দিতে? জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা ইউনেপ ২০২১ সালে ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স নামে রিপোর্ট প্রকাশ করে যাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বছরে এক কোটি ৬ লাখ টন খাদ্য অপচয় হয়, যেখানে মাথাপিছু খাদ্য অপচয় বছরে প্রায় ৬৭ কেজি। সকল খাদ্যের মধ্যে একটি বড় অংশ হলো প্রাণীজ আমিষ। যার বড় একটা অংশ আসে মাছ, মাংস, ডিম এবং দুধ থেকে। দেশে প্রতিবছরই ডিম, দুধ ও মাংসের উৎপাদন বাড়ছে।



সূত্র : প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর

গত ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে চাহিদার তুলনায় ডিম, দুধ ও মাংসের উৎপাদন বেশি হয়েছে। উপরোক্ত সরকারি সংস্থাটির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বশেষ অর্থবছরে দেশে ডিম, দুধ ও মাংস এই তিন প্রাণিজ আমিষের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হয়েছে। কিন্তু তারপরও ভোক্তাদের গুনতে হচ্ছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী অর্থ। এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির একটি বড় কারন হচ্ছে সঠিক ভাবে খাদ্যকে সংরক্ষন করতে না পারা।

তাই খাদ্যের সঠিক পুষ্টিগুন রক্ষার্থে প্রয়োজন টেকসই প্রযুক্তির ব্যাবহার, নিম্নে নিত্য দিনের খাবার টেবিলের মাংস, ডিম, এবং দুধ সংরক্ষণের কিছু পদ্ধতি তুলে ধরা হলো-

১. দুধ সংরক্ষণ:

তরল দুধ খুবই পুষ্টিকর খাবার। তবে কয়েক ঘন্টা বাইরে রাখলেই নষ্ট হয়ে যায় এর পুষ্টিগুন ও স্বাদ। তরল দুধ ৫ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত ফ্রিজে রাখলে ভালো থাকে।

আর ফ্রিজারে রাখলে তিন মাস পর্যন্ত ভালো থাকে তবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় পুষ্টিগুন। তাই সঠিক পুষ্টিগুন বজায় রেখে দীর্ঘদিন দুধ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয় কিছু আধুনিক প্রযুক্তি।

পাস্তুরাইজেশন: যে প্রক্রিয়ায় তাপ প্রয়াগের মাধ্যমে দুধ বা অন্যান্য তরল খাবারের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রেখে শুধুমাত্র রোগজীবাণু ও সেই সঙ্গে অন্যান্য জীবাণুর অধিকাংশ ধ্বংস করা হয় তাকে পাস্তুরাইজেশন বলে। এ পদ্ধতিতে লাইপেজসহ যে এনজাইমগুলো দুধের পচন বা বিস্বাদের সৃষ্টি করে সেগুলো ধ্বংস হয়। দুধ পাস্তুরাইজ করতে কমপক্ষে ৬২° ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় অন্তত ৩০ মিনিট অথবা ৭০° ডিগ্রি সে তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড রাখার পর সাথে সাথে ১০° ডিগ্রি তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করা হয়। এ পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত। দুই ধরনের পাস্তুরাইজেশন রয়েছে উচ্চ-তাপমাত্রা শর্ট-টাইম এবং অতি-উচ্চ তাপমাত্রা পাস্তুরাইজেশন। এ প্রক্রিয়ায় যক্ষা, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি রোগের জীবাণু ধ্বংস হয় । এতে করে দুধ খেতে নিরাপদ হয় এবং সংরক্ষণেও সুবিধা হয়।

স্টেরিলাইজেশন: ১১০°-১২১° ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ১৫-৩০ মিনিট ধরে তাপ দিয়ে দুধে উপস্থিত স্পোর সৃষ্টিকারী জীবাণুসহ সব ধরনের জীবাণু ধ্বংস করে সংরক্ষণ করাকে স্টেরিলাইজেশন বলে। এ ধরনের দুধ কমপক্ষে ৭-৩০ দিন রাখা যায়। এছাড়াও দুধ সংরক্ষণে রয়েছে আরো বেশ কিছু পদ্ধতি।

হিমায়ন: হিমায়ন হল দুধ সংরক্ষণের সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি। যখন রেফ্রিজারেটরে দুধ সংরক্ষণ করা হয়, তখন তাপমাত্রা হ্রাস পায়, যা ব্যাকটেরিয়া এবং এনজাইমের বৃদ্ধিকে ধীর করে দেয় যা নষ্ট করে দেয়। এভাবে বেশ কিছুদিন দুধ সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

ক্যানিং: ক্যানিং এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে দুধ জীবাণুমুক্ত করা হয় এবং বায়ুরোধী পাত্রে সিল করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি সমস্ত ব্যাকটেরিয়া এবং এনজাইম ধ্বংস করে, নষ্ট হওয়া রোধ করে। টিনজাত দুধ এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

২. ডিম সংরক্ষণ

ডিমের মূল গুণাগুণ বজায় রাখতে সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। দিনে ৩-৪ বার ডিম সংগ্রহ করতে হবে। গরমকালে ডিম সংগ্রহের পরই যতটা সম্ভব ঠান্ডা জায়গায় জড়ো করতে হবে। কিছু দিনের জন্য রাখতে চাইলে ১২.৮° ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় এবং মাসের পর মাস ডিম রাখতে চাইলে ১.৭°-০.৬° ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। ঠান্ডা ঘরের আর্দ্রতা হবে ৮৫%।

আধুনিক পদ্ধতিতে ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ডিম সংরক্ষণ করা গ্রামীণ পরিবেশে সম্ভব নয়, কারণ এতে যে প্রযুক্তি ও আধুনিক সরঞ্জামের প্রয়োজন তা আমাদের নেই। তাই সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতিকে এড়িয়ে দেশিয় উপযোগী পদ্ধতি ব্যবহারের দিকে নজর রাখা দরকার, যাতে করে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

(ক) সোডিয়াম সিলিকেট দ্বারা সংরক্ষণ-ভালো ডিম বাছাই করে তরল সোডিয়াম সিলিকেটে সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ১ কেজি সোডিয়াম সিলিকেট ১০ লিটার পানিতে ভালোভাবে গুলে তরল করা হয়। এই তরলে ১৫ ডজন ডিম সংরক্ষণ করা যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আড়াই মাস পর্যন্ত ডিম ভালো থাকে।

(খ) চুনের পানি দ্বারা সংরক্ষণ- এ পদ্ধতিতে ১ কেজি চুন ২০ লিটার পানিতে গুলে ১০ মিনিট থিতাল হয়। চুনের পানিতে ডিম ডুবিয়ে রাখা হয়। এ উপায়ে ২ মাস পর্যন্ত ডিম সংরক্ষণ করা যায়।

(গ) তেল দ্বারা সংরক্ষণ- এ পদ্ধতিতে বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধহীন নারিকেল বা সয়াবিন তেল ব্যবহার করা হয়। তেলে ডিমগুলো ডুবিয়ে পরে অন্য পাত্রে উঠিয়ে রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে ডিম পাড়ার পর পরই সংরক্ষণ করতে হয়। এভাবে প্রায় এক মাস পর্যন্ত ডিমের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব। প্যারাফিন ডিমে মাখিয়ে এটাই করা সম্ভব।

এ গুলো ছাড়াও আধুনিক সংরক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে হিমায়িত শুষ্ক ডিম। ডিমকে পুরোপুরি শুকনো করার ব্যবস্থা এখন আরও বেশি চালু। স্থানান্তর করতে জায়গা যেমন কম লাগে ঠিক তেমনি ঠান্ডা ঘরের কোন দরকার পড়ে না। তবে প্রক্রিয়ার মূলধন বেশি লাগে।

৩. মাংস সংরক্ষন

মাংস একটি প্রথম শ্রেণির ও উচ্চমানসম্পন্ন আমিষজাতীয় খাবার, যাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন এবং জিংক, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, সেলেনিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতির মতো মিনারেল আছে। যুগ যুগ ধরে মাংস খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু রাসায়নিক ও এনজাইমেটিক গঠনগত কারণে বাইরের আর্দ্রতা, আলো, তাপ, জীবাণু, অক্সিজেন প্রভৃতির প্রভাবে পচনে সহায়তাকারী ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, মোল্ডের মতো মাইক্রো অর্গানিজমের সংক্রমণে মাংস খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে, যা থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবাহিত রোগ তৈরি হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। মাংস সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো- মাংসকে জীবাণুমুক্ত রাখা, মাংসের স্বাদ ও গুণগত মান যতটা সম্ভব অক্ষুন্ন রাখা, মাংসের পচন রোধ করা, মাংস দ্বারা খাদ্যবাহিত রোগ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করে আর্থিক ক্ষতি কমানো। মানুষ সেই প্রাচীনকাল থেকে দেশ-বিদেশে, ঘরে ও বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন উপায়ে মাংস সংরক্ষণ করার কৌশল ব্যবহার করে আসছে, যা এখন আরও উন্নত, সহজ ও যুগোপযোগী হয়েছে। প্রথমেই আসি ঘরোয়া কী কী উপাদান দিয়ে মাংস সংরক্ষণ করা যায়।

আদার গুঁড়া, মিট এনহ্যান্সার, সয়া প্রোটিন পাউডার, ভিনেগার, কিউরিং সল্ট, ভেজিটেবল প্রোটিন, পাপরিকা পাউডার, সেলারি পাউডার এবং আলু দিয়ে ঘরোয়া পদ্ধতিতে মাংস সংরক্ষণ করা যায়।

ফ্রিজিং: সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে ডিপ ফ্রিজে মাংস সংরক্ষণ করা। আমরা জানি, মাংসের ৫০-৭৫ ভাগ পানি। এই পানি থেকেই পচনশীল জীবাণু সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই ০° ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রার নিচে ফ্রিজে মাংস সংরক্ষণ করা উচিত এবং -২০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে ওই পানির শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগই ক্রিস্টাল হয়ে পচন রোধ করে। মাংস এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণের সময়ে পাস্টিক ব্যাগ/ব্যবহার না করে ভ্যাকিউম-সিল্ড ব্যাগ ব্যবহার করা স্বাস্থ্যসম্মত। মাংসের পুষ্টিমান ও স্বাদ ভালো রাখতে চাইলে গরুর মাংস ৮-১২ মাস এবং যেকোনো ধরনের মুরগির মাংস ৩-৬ মাসের বেশি ফ্রিজে সংরক্ষণ করা উচিত নয়।

ড্রাইং পদ্ধতি: পুরোনো এই পদ্ধতিতে মাংস রোদে বা চুলায় জ্বাল দিয়ে ৭০ থেকে ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে নিতে হয়; যা সবচেয়ে কম খরচে করা যায়। এই পদ্ধতিতে মাংসের চর্বি ফেলে দিয়ে পাতলা করে কেটে ভ্যাকিউম-সিল্ড করে ফ্রিজে ১ বছর পর্যন্ত রাখা যায়।

স্মোকিং: এটিও একটি পুরোনো পদ্ধতি, যেখানে হট স্মোকিং অর্থাৎ ৩০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মাংস পোড়ানো হয় এবং কোল্ড স্মোকিং পদ্ধতিতে ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা ধরে স্মোকিং আগুনে ৮৫° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পোড়াতে হয়, যাতে তাপের ধোঁয়ায় মাংসের মাইক্রোবসগুলো নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে অবশ্য এই পদ্ধতির জন্য কিছু তরল স্মোক প্রিপারেশন পাওয়া যাচ্ছে, যা সাধারণত মাংস ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে থাকেন।

সল্টিং বা লবণ পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে খাওয়ার লবণ, কিউরিং লবণ, মসলা এবং ব্রাউন চিনি অথবা খাবার লবণ, সোডিয়াম নাইট্রেট ও সোডিয়াম ল্যাকটেট দিয়ে মাংস মেখে ২৪ ঘণ্টা রেখে ফ্রিজে ১ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

এই পদ্ধতিতে মাংস সবচেয়ে বেশি ফ্রেশ এবং পুষ্টিগুণসম্পন্ন হয়ে থাকে। মাংসের অক্সিডেটিভ ও মাইক্রোবিয়াল পচন প্রতিরোধ এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে ভালো হয়।

ক্যানিং পদ্ধতি: এই পদ্ধতিকে থার্মাল স্টেরিলাইজেশন বলে। যেখানে প্রথমে মাংস প্রায় ২৫০° ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ড্রাই করে ঠান্ডা করা হয়। কাচের জার বা বয়ামের মুখ আটকে তাতে এই মাংস প্রায় এক বছর রাখা যায়। এই পদ্ধতিতে মাংস সংরক্ষণ করতে গেলে কয়েকটি বিষয় খুব খেয়াল রাখতে হয়। প্রথমে মাংস কাটা, রান্নার আগে সিমিং, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, ঠান্ডা করা ইত্যাদি।

এ ছাড়া নতুন আরো কিছু পদ্ধতিতে মাংস সংরক্ষণ করা যায়, যা আরও বেশি নির্ভরযোগ্য। উক্ত পদ্ধতিতে অধিকাংশ মাইক্রো অর্গানিজম মেরে ফেলা হয়। ফলে মাংস স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন হয়ে থাকে।

দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করলেও আমরা এখনো নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে পারিনি এবং এর জন্য দ্বায়ী ভোক্তা লেভেলের আমরা সবাই। উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা সহজেই পারি নিজের পরিবারের সারা বছরের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

নিরাপদ ফসল উৎপাদনে জৈব উপাদানের ব্যবহার-একটি ভূমিকা

প্রফেসর ড মোঃ মহিদুল হাসান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর-৫২০০

বাংলাদেশের মোট GDP-তে কৃষির BBS, (২০২১-২০২২) অবদান ১১.৫০ শতাংশ। গত দশকে বাংলাদেশের কৃষি ব্যাপক মাত্রায় পরিবর্তন ঘটিয়ে গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে বাণিজ্যিক ধারায় প্রবেশ করেছে। এই পরিবর্তনের ধারায় ব্যপক মাত্রায় ফসলের উৎপাদন করার প্রয়াস চলেছে অধিক সংখ্যক মানুষের খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য। ফলে নতুন উন্নত ফসলের জাত উদ্ভাবনের সাথে সাথে হাইব্রিড জাতের আমদানি যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনই ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, হরমন ইত্যাদির ব্যবহার। রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যাপক ও যথেচ্ছ ব্যাবহার ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি পরিবেশ, মাছ, গবাদি পশু সহ মানুষের স্বাস্থের উপর গুরুতর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। সুতরাং বর্তমান সময়ের একটি চাহিদা তৈরি হয়েছে নিরাপদ খাদ্যের।

নিরাপদ খাবার এর চাহিদা অথবা আকাঙ্খা গোটা বিশ্ব সহ বাংলাদেশও ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্ব পাচ্ছে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যগত কারনেই নয়, অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেও। নিরাপদ খাবার অর্থাৎ নিরাপদ ফসল উৎপাদন তাই বর্তমান সময়ের অন্যতম একটি জরুরি বিষয় যা মানুষের সু-স্বাস্থের নিশ্চয়তা প্রদানের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের মার্কেট এর সাথে প্রতিযোগিতার জন্যও দেশকে উপযোগী করে তুলবে। নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে ২০২০ সালে "Good Agricultural Practices Policy (GAP)" প্রণয়ন করা হয়। GAP নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক সার, কীটনাশক, পানি, পরিবেশ বান্ধব ফসল ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহ প্রদান করে। সাথে সাথে কৃষি শ্রমিক ও কৃষকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি যেন রাসায়নিক দ্রব্যাদির জন্য ঝুঁকির মধ্যে না পরে সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে তাগাদা দেয়।

রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার কমিয়ে জৈব উপাদান ব্যবহার করে ফসলের রোগ ও পোকামাকড় দমন বর্তমানে একটি কার্যকর উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। জৈব উপাদান ফসলের রোগ ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনাই করে না, সাথে সাথে ফসলের ফলন বাড়ায়, শস্যের গুনগতমান বজায় রাখতে সাহায্য করে, এবং সর্বোপরি পরিবেশ ও মানুষ সহ পশুপাখির উপর কোন খারাপ প্রভাব ফেলে না । জৈব উপাদান হিসেবে সাধারণত উপকারি ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। এরা এন্টিবায়োটিক তৈরি করে, অথবা এনজাইম নিঃস্বরন করে ক্ষতিকর ছত্রাককে মেরে ফেলে। উপরন্ত তারা গাছের শিকড় এলাকা থেকে আয়রন কমিয়ে গাছের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে অথবা শিকড় এলাকায় নিজেদের সংখ্যা (কলনি) বাড়িয়ে অন্য ক্ষতিকর জীবাণুকে ফসলে আক্রমণ প্রতিরোধ করে। বেশীরভাগ জৈব উপাদান আবার গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় বিভিন্ন ক্ষতিকারক জীবাণুর বিপরীতে ফলে জৈব উপাদানগুলো কোন ধরনের ক্ষতি না করে টেকসই কৃষি উৎপাদনে প্রতিশ্রুতিশীল কারন তারা সর্বোত্তমভাবে ফসলের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতা বাড়িয়ে দেয়।

বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত একটি উপকারী ছত্রাক হল Trichoderma যেটা অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করছে। সরকার ঘোষিত GAP পলিসি বাস্তবায়নে, পরিবেশ সুরক্ষায় ও মানুষ সহ বিভিন্ন পশুপাখির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যা ইতিমধ্য ব্যাপক সারা ফেলেছে। Trichoderma রাসায়নিক উপাদানের তুলনায় কম খরচে উৎপাদন করা যায়, টেকসই ফসল উৎপাদন করে, অনেক মাইক্রো পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা বাড়িয়ে দেয়। Trichoderma এর পাশাপাশি বিভিন্ন উপকারী ব্যাকটেরিয়াও রাসায়নিক উপাদানের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে Trichoderma যতটুকু প্রসার ঘটেছে, ব্যাকটেরিয়ার প্রসার তার তুলনায় অনেক কম। সুতরাং জৈব উপাদান ব্যবহারের ব্যাবহার ও বর্তমানে অবস্থায় তাদের যে কার্যক্ষমতা আছে তা বাড়ানোর সমূহ সম্ভাবনা বাংলাদেশে আছে।

সম্প্রতি ইউরোপীয় গ্রীন ডিল "ফার্ম টু ফর্ক" কৌশল একটি টেকসই এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য ব্যবস্থা তৈরির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করেছে যেখানে ফসলের সুরক্ষা প্রদানকারী পণ্যগুলির একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। কৃষি জমি এবং পরিবেশগত বিরুপ প্রভাব (মাটি, জল, স্বাস্থ্য) কমানোর উদ্যেশে ইউরোপীয় গ্রীন ডিল আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে রাসায়নিক এবং বিপজ্জনক কীটনাশকের ব্যবহার যথাক্রমে ৫০ ও ২৫ শতাংশ কমিয়ে জৈব উপাদনের ব্যবহার বাড়ানোর একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জৈব উপাদান যথা উপাকারি ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া মূল ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশ অচিরেই উন্নত বিশ্বের কাতারে নিজেকে দেখতে চায়। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সামনে আগানোর অনেকগুলো দায়িত্বও পালন করা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। ইউরোপীয় গ্রীন ডিল-এর সাথে সামাঞ্জস্য রেখে আমাদেরকেও বিপজ্জনক রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ কামানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা দরকার বলে বিজ্ঞজন মনে করেন। বাংলাদেশে অনেক গবেষক ও প্রতিষ্ঠান উপকারী ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ, তাদের জমিতে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা, ও বানিজিকিকরণ এইসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন। যদিও আমাদের কৃষক বন্ধুরা এখনও রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারে বেশি উৎসাহী, কিন্তু জৈব উপাদানের ব্যবহারও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে যা বেশ উৎসাহব্যাঞ্জক। সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে ভাবে জৈব উপাদান উৎপাদন ও বিপণন এ এগিয়ে আসছে, হয়ত অচিরেই আমাদের কৃষক বন্ধুরা আরও অধিক পরিমাণে আগ্রহ বোধ করবে জৈব উপাদান ব্যবহারে, আমরা এ আশাই করতে চাই ।

দুধের নিরাপদতায় গুড এনিমেল হাজবেন্ড্রী প্র্যাকটিস

কৃষিবিদ ডক্টর এস. এম. রাজিউর রহমান, জাতীয় প্রতিাণিসম্পদ ও ডেইরি বিশেষজ্ঞ, জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা
মোবাইল: ০১৭১৭৯৭৯৬৯৭, Email: smrajiurrahman@yahoo.com

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বয়সের নর-নারীর জন্য দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। সুস্থ সন্তান মানেই মেধাবী জাতি। আর মেধাবী জাতির জন্য মা ও সন্তানকে সুস্থ রাখতে খেতে হবে প্রতিদিন নিরাপদ দুধ। তাই প্রতিবাদ রয়েছে আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। বাংলাদেশ প্রতিটি মানুষের জন্য প্রতিদিন ২৫০ মিলি লিটার দুধ প্রয়োজন। অথচ সরকারি তথ্যমতে বর্তমানে আমরা দুধ পাচ্ছি প্রতিদিন ১৯০-১৯৩ মিলি লিটার। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য তা আরো অপ্রতুল। এক জরিপে জানা যায়, ২০১৫ সালে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ২৯% বাসিন্দা সপ্তাহে একবার দুধ খেত, ২০২১ সালে তা বেড়ে ৬৯% হয়েছে (দৈনিক প্রথম আলো ০২ জুন ২০২১)। 'নিউট্রিশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড-২০১৯' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের প্রতি ৬ জন মানুষের মধ্যে একজন অপুষ্টির শিকার। অপুষ্টির কারণে ৫ বছরের কম বয়সী ৩৬ শতাংশ শিশু উচ্চতা কম (অর্থাৎ খর্বকায়) ও ৩৩ শতাংশ ওজনে কম (অর্থাৎ কৃশকায়)। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) বাংলাদেশ ২০২০ সালের তথ্য অনুসারে শিশুর মাঝারি ও গুরুতর কম ওজনের প্রবণতা ২০১২-১৩ সালে ছিল ৩১.৯ শতাংশ যা ২০১৯ সালে ২২.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। একইভাবে, শিশুর মাঝারি এবং গুরুতর উচ্চতা ২০১২-১৩ সালে ৪২ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ২৮ শতাংশে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

আল্লাহ তাআলার অনন্য নেয়ামতের মধ্যে দুধ একটি। একে সুপার ফুড বলা যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে দুধকে সুস্বাস্থ্যের জন্য অতুলনীয় পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। গৃহপালিত গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও উট থেকে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন এসব দুধ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন- 'আর গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। তার উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।' (সুরা নাহল: আয়াত ৬৬)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,'দুধ ছাড়া আর কোনো (খাবার) জিনিস নেই, যা একই সঙ্গে খাবার ও পানীয় উভয়টির জন্য যথেষ্ট হয়।' (আবু দাউদ)। দুধে রয়েছে প্রচুর পুষ্টিগুণ, যেমন পানি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস, প্রেতিাটিন, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন-বি ১২, নিয়াসিন, কোলেস্টেরল ও রিবোফ্লেভিন। দুধ দেহের পেশী গঠনে, ক্ষয়পূরণের কার্যকরী। দুধে প্রায় ৭০% স্যাচুরেটেড ফ্যাটিএসিড ও ২৭% মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড থাকে। এতে আছে কনজুগেটেড লিনোলিক এসিড ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ও হার্টের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করে। দুধের কার্বোহাইড্রেট গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ এর সমন্বয়ে গঠিত ল্যাকটোজ যা মস্তিস্ক বিকাশের সহায়ক।

দুধের ল্যাকটো পারঅক্সিডেজ এনজাইম ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। দুধে আছে ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া যা পাকস্থলীর ক্ষুদ্রান্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া দুধের ল্যাকটোফেরিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ল্যাক্টোফেরিন, একটি মাল্টিফ্যাকশনাল গ্লাইকোপ্রোটিন, যা অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল এবং ইমিউন নিয়ন্ত্রক প্রোটিন। এর জৈবিক ক্রিয়াকলাপগুলি অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিফাঙ্গাল ও অ্যান্টিকারসিনোজেনিক (ওয়াং এট আল, ২০১৭)। পাস্তুরাইজ দুধে ল্যাকটোফেরিন অবস্থা ইউ.এইচ.টি দুধের চেয়ে ভালো থাকে। সুতরাং আমাদের পাস্তুরাইজ দুধ খাওয়ার দিকে গুরুত্ব দেয়া ভালো। দুধে ল্যাকটোফেরিন নামক প্রোটিন এন্টিভাইরাল এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, যা কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে '(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা' হলো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। তবে এখন শুধু খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করলেই হবে না, সেটিকে নিরাপদও রাখতে হবে। তাই আমাদের নিরাপদ দুধ উৎপাদনের দিকে নজর দিতে হবে ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গবাদিপ্রাণি পালনের হার না বাড়ায় দুধ উৎপাদনে ঘাটতি থাকছে বর্তমানে প্রায় ১৬%। দুধের চাহিদা বাড়ায় খোলা বাজারে গাভীর তরল দুধে ভেজাল মেশানোর প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়েছে। একসময় দুধের পরিমাণ বাড়াতে পানি মেশানো হলেও এখন আর তা পানিতে সীমাবদ্ধ নেই। এখন দুধে মিশে যাচ্ছে মানব স্বাস্থ্যের জন্য নানাবিধ ক্ষতিকর অণুজীব ও রাসায়নিক; যেমনঃ অ্যান্টিবায়োটিক রেসিডিউ, ফরমালিন, ডিটারজেন্ট, কীটনাশক, ভারী ধাতু ইত্যাদি। কেবল খোলা তরল দুধেই নয়, বিভিন্ন কোম্পানির বাজারজাত করা প্যাকেটজাত তরল দুধেও পাওয়া যেতে পারে ক্ষতিকর এসব অণুজীব ও রাসায়নিক পদার্থ। এসব পদার্থ সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশী হলে দুধ খাওয়ার অনুপযোগী হয়, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যেমনঃ দুধে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি নিয়েও মান নির্ধারন রয়েছে; উত্তম পাস্তুরাইজ দুধে মোট ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রতিতি মিলি দুধে ২০ হাজারের বেশি থাকবে না আবার একইভাবে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া প্রতি মিলি দুধে দশটির বেশি থাকা উচিত নয়। গরু অসুস্থ হলে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার যেমন প্রয়োজন তেমনি এন্টিবায়োটিকের প্রত্যাহার কাল ৭ থেকে ১০ দিন নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।

এ সময় দুধ দোহন করে উক্ত দুধ খাবারের জন্য বিক্রয় করা যাবেনা। কিন্তু এ ব্যবস্থা সঠিকভাবে নিশ্চিত করার জন্য খামারিদের প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা থাকা আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য সঠিক নিয়ম-নীতির প্রয়োগ করতে সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে। আবার গবাদি পশুর খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের আদর্শ ডোজ অনুসরণ, নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে খাদ্যের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের জন্য নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। গুড এনিমেল হাজবেন্ড্রী প্র্যাকটিস্যের মাধ্যমে নিরাপদ দুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত সকল খামারি ও অংশিজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। ডেইরি খামারের জন্য গুড প্রাকটিস প্রটোকল তৈরি করতে হবে,যা গুড ডেইরি প্রাকটিস নামে অভিহিত হতে পারে। গুড প্র্যাকটিসের (জিপি) চারটি স্তম্ভ রয়েছে যেমন ইহা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, ও সামাজিক ভাবে স্থায়িত্বশীল এবং খাদ্যে নিরাপদতা থাকবে। জিপি অবশ্যই প্রযুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সেট আপের একটি ইউনিক মিশ্রণ যা, কৃষকদের জীবিকার উপর উল্লেখযোগ্য এবং টেকসই প্রতিভাব ফেলে। এছাড়াও এটি সাপ্লাই চেইনের সকল অংশিজনকে সংবেদনশীল করে, একত্র করে এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে যা, বিভিন্ন প্রচলিত এবং সুপারিশকৃত অনুশীলনের সংকলন। তাই গুড অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি প্র্যাকটিস খামার অনুশীলনের ন্যূনতম মানগুলি নিশ্চিত করবে যা ভোক্তাদের চূড়ান্ত পণ্যগুলি সম্পর্কে আস্থা প্রদান করবে ও মানুষের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত হবে। এ ধরনের উত্তম চর্চা সমূহ/বা অনুশীলন সমূহ পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে খামার শ্রমিক এবং প্রতিাণী উভয়ের জন্য স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ অবস্থা নিশ্চিত করবে।

এছাড়াও প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ খাতের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু প্রবিধান বিদ্যমান আছে, যা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ (কম্পিট্যন্ট অথরিটি) এই প্রবিধান বাস্তবায়নের জন্য দায়ী, যেটা কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করে এবং কখনও কখনও এটি ওভারল্যাপিং তৈরি করে; এগুলি সবই ভোক্তাদের কাছে নিরাপদ প্রাণীপণ্য পৌঁছাতে বাধার সৃষ্টি করে। তাই, যে কর্তৃপক্ষগুলি প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ খাতে কাজ করার জন্য আইন ও বিধি প্রণয়ন করেছে, তাদের একে অপরের সাথে আলোচনা করা উচিত এবং নিরাপদ প্রাণী খাদ্য উৎপাদনের জন্য একই আইনি ভিত্তিতে একসাথে কাজ করার জন্য একটি সাধারণ ঐকমত্যে আসা উচিত। বিভিন্ন উন্নত দেশে একটি স্বাধীন কমিশন রয়েছে যা নিয়মিতভাবে সম্মতির জন্য সমস্ত অনুশীলন/উত্তম চর্চা, আইন এবং নীতিগুলি পরীক্ষা করে এবং কার্যকারিতার জন্য মূল্যায়ন করে। সদ্য প্রতিতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড"-এর উচিত নিরাপদ খাদ্য ও ন্যায্য বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, উত্তম চর্চা অনুশীলনের উন্নতির জন্য একটি আদর্শ আইন ও নিয়ম প্রণয়নের মাধ্যমে সেই সমস্ত অসঙ্গতি দূর করা। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডি.এল.এস) প্রাণিজাত খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করতে এবং জনস্বাস্থ্য সম্ভাব্য ঝুঁকি কমানোর নিমিত্তে গুড এনিম্যাল হাজবেন্ড্রী প্র্যাকটিস মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন এবং এ অনুযায়ী ডেডিকেটেড ইন্সপেকশন সিস্টেম চালু করা উচিত। পরিশেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠে তাল মিলিয়ে বলতে চাই "আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভলপ করতে পারি ইনশাআল্লাহ এ দিন থাকবেনা। গুড এনিমেল হাজবেন্ড্রী প্র্যাকটিস ইতিমধ্যে ডেভলপ হয়েছে, প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো তৈরি ও বাস্তবায়ন করলেই আমরা নিরাপদ দুধ সকলের জন্য নিশ্চিত করতে পারব।

সেফ ফুড ডাইজেস্ট
বর্ষ ৪ সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০২৩

ভেজাল যুক্ত খাদ্যের ঝুঁকি এবং তার প্রতিকার

প্রফেসর ড. তাহেরা ইয়াসমিন, ডেইরী এন্ড পোল্ট্রি সায়েন্স বিভাগ, ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সায়েন্স অনুষদ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর-৫২০০

ভূমিকা

ভেজালের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলছে। নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য এবং রাসায়নিক কিংবা ভেজাল মেশানো খাবার যেন আমাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। ভেজাল খাদ্যের দৌরাত্ম্যে কোনটি ভেজাল আর কোনটি ভেজালমুক্ত তার পার্থক্য করাটাই এখন দুষ্কর হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে অসাধু ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞানকে খারাপ কাজে ব্যবহার করছে। তারা নকল খাদ্যও উপাদান করছে। এগুলো প্রতারণা তো রয়েছেই, তার চেয়ে বেশি রয়েছে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো কোনো কোনো নকল ও ভেজালের কারণে অত্যন্ত মারাত্মক স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হয়। আজকের বাংলাদেশে আমরা ক্রেতা ও ভোক্তারা খাদ্যসামগ্রীর নকল ও ভেজালের কারণে অত্যন্ত অসহায়। বিশেষ করে ছোট শিশু ও গর্ভবতী মা, কিশোর-কিশোরীরা নকল ভেজালের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে বড় শিকার। সাধারণভাবে বলা যায় যে, এসব রাসায়নিক দ্রব্য, রং ও উপাদানের প্রভাবে এলার্জিক প্রতিক্রিয়া, হাঁপানি, হজমের গোলযোগ, পেটে তীব্র গ্যাস ও পেপটিক আলসার হয়। তাছাড়া লিভারের মারাত্মক ক্ষতি, কিডনীর অকার্যকারিতাসহ নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি ও জীবনহানি ঘটতে পারে।

খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্যের অপব্যবহার

খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্যের অপব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। জনসংখ্যার চাপ, অর্থনৈতিক সমস্যা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি কারণে খাদ্যে ভেজালের পাশাপাশি অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার অবাধে করছে। এসব রাসায়নিক দ্রব্য মানুষের স্বাভাবিক শরীর ও শারীরিক কার্যক্রমে মারাত্মক বাধার সৃষ্টি করে ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর প্রভাব ফেলে। বর্তমানে সারাদেশে খাদ্যে ভেজাল এক মহামারি আকার ধারণ করেছে। বাজারে সব ধরনের ফলমূল, তরিতরকারি, মাছ, মাংস এবং পচনশীল দ্রব্যকে নানা রকম বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত করে স্থায়িত্ব বাড়ানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও ফল পাকাতে বিভিন্ন কেমিক্যাল ব্যবহার, সাদা ডিমে বিষাক্ত কেমিক্যাল দিয়ে লাল করা, সস ও জেলিতে বিষাক্ত রং মেশানো, খামারের গরুকে মোটাতাজা করার জন্য মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সার ও খাবার সোডা খাওয়ানো। এতে গরুর মাংস মানুষের শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়। বাজারে ছোলা, মসুর ডাল, ডাবলি, মাষ কলাই ও মুগ ডালে বিষাক্ত রং মিশিয়ে বিক্রি করা, চাইনিজ রেষ্টুরেন্টগুলোতে খাবারকে সুস্বাদু করতে মাত্রাতিরিক্ত টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করা যা মানুষের শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। জুস, বেকারির কেক, বিস্কুট এবং কোমল পানীয়তে চিনির বদলে চিনির চেয়ে দামে সস্তা মিস্টিকারক পদার্থ ব্যবহার হয় যা মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক

বর্তমানে জনস্বাস্থ্য বিভিন্ন কারণে হুমকির সম্মুখীন। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই অসচেতন। নিজেদের ভাল-মন্দ বা স্বাস্থ্য সচেতনতা তাদের মধ্যে খুব কম দেখা যায়। রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত ভেজাল খাদ্যের কারণে জনগণের স্বাস্থ্য সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। নিম্নের বিভিন্ন রাসায়নিকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তুলে ধরা হলো:

১. **ফরমালিন:** পঁচনশীল খাদ্য দ্রব্যের স্থায়িত্ব বাড়াতে যদি ফরমালিনজাতীয় পদার্থ ব্যবহৃত হয় তবে তা শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সার ছাড়াও লিভার, কিডনি, পাকস্থলীর ক্ষতি করে। গর্ভবতী মায়েদের শিশু বিকলাঙ্গ হয়। দীর্ঘদিন ফরমালিনের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তির বমিভাব, মাথাব্যথা, শ্বাস নিতে কষ্ট, হাঁপানি এবং ফুসফুস ও গলবিলে ক্যান্সার দেখা দেয়। ফরমালিন পানিতে মিশিয়ে ব্যবহারের ফলে হাতে ঘা হতে দেখা যায়।

২. **ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য:** আমাদের দেশে কাঁচা ফলগুলো বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে কৃত্রিমভাবে দ্রুত পাকিয়ে বাজারে বিক্রি করার প্রবণতা রয়েছে। কৃত্রিমভাবে পাকানো এসব ফল খেলে পেটে জ্বালাপোড়া, অতিরিক্ত পিপাসা, রক্তসহ ডায়রিয়া, দুর্বলতা, হাত ও পায়ের অসাড়তা, রক্তচাপ কমে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৩. **কৃত্রিম রং:** রং মেশানো খাদ্য ও সবজি দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে মানুষের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে এসব খাদ্য গ্রহণকারী ব্যক্তি স্নায়ুতন্ত্র বিকলসহ বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

৪. **হাইড্রোজ:** চাল, মুড়ি, চিনি ইত্যাদি সাদা করার জন্য ব্যবহার করা হয় হাইড্রোজ। এটি মুখগহ্বর, পরিপাকতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে।

৫. **টেস্টিং সল্ট:** অনেক খাবারে টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করা হয় খাবারকে সুস্বাদু করার জন্য। এ রাসায়নিক উপাদানটির নাম মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট। টেস্টিং সল্ট খাওয়ার ফলে মানুষের শরীরে, বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা, অনিদ্রা, খাবারে অরুচি, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, দুর্বলতা, স্নায়ুতন্ত্রের অসুখসহ শিশুদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায় এবং উগ্র মেজাজি হয়।

৬. **লেদার কালার ও টেক্সাইল কালার:** বাজারে তৈরি বিভিন্ন তথাকথিত ফলের রসে থাকে লেদার কালার ও টেক্সটাইল কালার। এসব রং খাওয়ার ফলে আমাদের শরীরের এমন কোনো অঙ্গ নেই যা ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।

৭. **ভেজাল ঔষধ:** ভেজাল ও নিম্নমানের ঔষধ সেবনের ফলে রোগ সারানোর বদলে নতুন নতুন জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

৮. **সোডিয়াম সাইক্লোমেট:** দই, মিষ্টি, আইসক্রিম, বিভিন্ন পানীয়, চকোলেট, কফি তৈরির কোম্পানিগুলোতে এসব খাদ্য তৈরীর সময় সোডিয়াম সাইক্লোমেট ব্যবহার করা হয়। সাইক্লোমেট ব্যবহারে হৃৎপিন্ডের মাংসপেশি শক্ত হয়ে যায়, ফুসফুস, লিভার, লিম্ফেটিক সিস্টেমে টিউমার হয়, গর্ভবতী মায়ের বাচ্চা ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত হতে পারে।

৯. **রাসায়নিক সার ও কীটনাশক:** কৃষকরা রাসায়নিক সার ব্যবহারে অধিক ফলন পেতে শুরু করলে এটির ব্যবহার আরও বেড়ে যায়। এর দীর্ঘদিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় জমিগুলো হারাতে থাকে উর্বরতা। প্রায় একই কথা প্রযোজ্য কীটনাশকের বেলাতেও। এসব কীটনাশকের কিছু অংশ ফলমূল ও শাক-সবজির সাথে মিশে আমাদের খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। মানুষ ও প্রাণিদেহে এই রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রবেশের ফলে ক্যান্সার, শিশুর জন্মগত ত্রুটি, বন্ধ্যাত্ব, যকৃতের রোগসহ শরীরের সর্বিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

এক কথায় বলা যায় খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্যের অপব্যবহার জনমানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই এর প্রতিরোধে জন সাধারণকে এখনই সচেতন হতে হবে।

খাদ্যে ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্যের অপপ্রয়োগের বিরূদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি

খাদ্যে ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো একটি সামাজিক ব্যাধি। তাই অন্যান্য সামাজিক ব্যাধির মতো খাদ্যে ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার রোধেও চাই ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা ও কার্যকর প্রতিরোধ। ভেজাল সম্পর্কে কমবেশি সবারই জানা। আধুনিককালে খাদ্যদ্রব্য যান্ত্রিক উপায়ে প্রক্রিয়াকরণের সময় ভেজাল ও অখাদ্য এমনভাবে মেশানো হয় যে, আসল নকলে পার্থক্য নিরূপণ করা সাধারণভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে না। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর ফলে খাদ্যের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত যেসব খাদ্যে ভেজাল মেশানো হয়-

(১) **গরুর দুধ:** এর প্রধান ভেজাল পানি। অনেক সময় তেল, ময়দা, চুন ইত্যাদি খাঁটি দুধের সাথে মেশানো হয়। এছাড়া সোহাগা, বোরিক এসিড ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য দুধের সাথে মেশানো হয়। ইদানিং গুঁড়া দুধে মেলামাইন যোগ করার কথা শোনা যায়।

(২) **মাখন:** মাখনে পানি, তেল, মার্জারিন, নারকেল তেল এবং অল্পদামের ঘি ইত্যাদি ভেজাল মেশানো হয়।

(৩) **ঘি:** নারকেল তেল, চীনাবাদামের তেল, প্রাণির চর্বি, ভেজিটেবল ও পাম ওয়েল, পাকা কলা ও বেসনসহ ইত্যাদি ভেজাল মেশানো হয়।

(৪) **সরিষার তেল:** এর সাথে চিনাবাদামের তেল, পেঁয়াজ, পাম তেল, তিলের তেল, তুলারবীজ, পোস্তদানা, সজনের ছাল বা মরিচ ইত্যাদি ভেজাল মেশানো হয়। কখনও কখনও গাড়ির ফেলে দেওয়া মবিল ছেঁকে কৃত্রিম রং মিশিয়ে তৈরি করা হয় নকল সরিষার তেল।

(৫) **আটা বা ময়দা:** আটা বা ময়দার মধ্যে প্রায়ই খড়িমাটি চূর্ণ, ফিটকিরি, কেওলিন (Kaolin), চালের গুঁড়া, ভুট্টা ও আলুর বেসন প্রভৃতি ভেজাল মেশানো হয়ে থাকে। আবার কখনও কখনও সাদা রংঙের পাথরের গুঁড়াও মেশানো হয়ে থাকে। কখনও কখনও আটার ভুষি ও খড়িমাটি মিশিয়ে বানানো হয় নকল ময়দা।

(৬) **সাগু বা বার্লি:** সাগু বা বার্লিতে খড়িমাটি, ছাতু, ময়দা প্রভৃতি ভেজাল মেশানো হয়ে থাকে।

(৭) **গুঁড়া মসলা:** বিভিন্ন প্রকার মসলার সাথে ইটের গুঁড়া, কাঠের গুঁড়া, চালের কুড়া ও ক্ষতিকর রাসায়নিক রং মেশানো হয়।

খাদ্যশস্য ও খাদ্য উপকরণে ভেজাল দেওয়ার মূল কারণ ব্যবসায়ীদের অতিমাত্রায় অর্থলোভ ও নৈতিকতার অবক্ষয়। তারা সামান্য বাড়তি লাভের আশায় মানুষকে প্রতারিত করে এবং দেশের আবাল, বৃদ্ধ, শিশু সবার মুখে বিষাক্ত খাদ্য তুলে দেয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জনসচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। নিম্নে জনসচেতনতা তৈরির উপায় আলোচনা করা হলো-

(১) রেডিও টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকাগুলি খাদ্যে ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণজাগরণ সৃষ্টি করতে পারে।

(২) মৌসুমের পূর্বে বাজারে সরবরাহকৃত ফল না খেয়ে মৌসুম শুরু হলে ফল খাওয়া।

(৩) যেসব ব্যক্তি খাদ্যে ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে তাদের নাম ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা পোস্টার ও প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করা, যাতে জনগণ এসব কোম্পানির তৈরি খাদ্য কিনে না খায়।

(৪) শিশুর জন্য মায়ের দুধ সর্বোত্তম খাবার। প্রতিটি মা যেন শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান-এ বিষয়ে মায়েদের সচেতনতা করতে হবে। মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপনে জনগণ যেন বিভ্রান্ত না হয়- এ ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

(৫) কৃত্রিমভাবে পাকানো ফল ও সবজি কেনার আগে ভালোভাবে দেখে যাচাই করে কেনা উচিত।

(৬) কৃষকদের মধ্যে জৈবসার এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কীটপতঙ্গ ধ্বংসের পদ্ধতি প্রচারের ব্যবস্থা করলে জমিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার অনেক কমে আসবে।

(৭) কেনার সময় সচেতন হওয়া, যেমন- মৌসুমী ফল চকচকে রঙের হলে, টমেটো, পেঁপে বেশি লাল বা হলুদ হলে, এছাড়া চিনি বেশি সাদা হলে সেগুলি কেনা পরিহার করা উচিত।

খাদ্যে ভেজালপ্রদানকারীর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা:

(১) খাদ্যে ভজাল মেশানোর জন্য প্রচলিত যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা জনসাধারণকে জানানো এবং ভেজাল শনাক্ত করে সংশ্লিস্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) খাদ্যে ভেজাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন সকল রাসায়নিক দ্রব্য যাতে খোলা বাজারে পাওয়া না যায় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩) সরকারি বা বেসরকারিভাবে গ্রাম, থানা ও উপজেলা পর্যায়ে সব খাদ্য বিপণিবিতানে এবং প্রতিটি বাজারে ভেজাল শনাক্তকরণে যন্ত্র স্থাপন করা, যাতে ক্রেতাগণ তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য যাচাই করে নিতে পারেন।

(৪) প্রতিটি বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের ব্যবস্থা করতে হবে ।

বাংলাদেশে ২০১৩ সালে খাদ্যে ফরমালিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। একই সাথে খাদ্য সংরক্ষণে যে কোনো অনুনোমোদিত রাসায়নিক প্রয়োগের অপরাধে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং ২০ লাখ টাকা জরিমানার বিধান তৈরি হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে নকল ও ভেজাল, এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক মিশ্রিত খাদ্য নষ্ট করা হচ্ছে।

উপসংহার

অনোনুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো খাবার শিশু, যুবক, গর্ভবতী মা, বৃদ্ধ সবার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো খাবার মানুষ খেলে মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে ও পুরো জাতি পঙ্গুত্বের শিকার হতে পারে। ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার রোধে চাই ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা ও কার্যকর প্রতিরোধ। ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতএব, জনগণের সচেতনতাই পারে এসব ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারকারীদের প্রতিরোধ করতে। বিভিন্ন গণমাধ্যম স্কুল ও কলেজে খাদ্যে ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি ও খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপি গণজাগরণ সৃষ্টি করতে পারে।





এতে এনরোফ্লক্সাসিন ২০% এবং ব্রোমহেক্সিন ১.৫% থাকায় এটি সালমোনেলা ই.কলাই, মাইকোপ্লাজমা সহ সকল ধরনের ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্য্যকর এক সমাধান

DAR NO. : 661-4927(V)-19

ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত ব্রোমেক্স ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী ব্রড স্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিক



এতে অ্যালবেন্ডাজল ১০% থাকায় এটি গোল কৃমি ফিতা কৃমি সহ সকল ধরনের কৃমির বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্য্যকর

DAR NO. : 661-4993(V)-2020

ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত ভার্মিসিড ১০ একটি আদর্শ, নিরাপদ ও ব্রড স্পেকট্রাম কৃমিনাশক



এতে টিলমাইকোসিন ফসফেট ২৫% থাকায় এটি মুরগির ঠান্ডা, গড়গড় শব্দ, কফ-কাশির সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও কার্য্যকর সমাধান

DAR NO. : 661-4917(V)-19

ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত টিলমাইকোডেম ২৫ মাইকোপ্লাজমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্য্যকর এক সমাধান

SAFE BIO PRODUCTS LTD.
Safe Products For Safe Life

Mohammaddullah Complex, Building-2 (1st Floor)
Mawna Chowrasta, Sreepur, Gazipur, Bangladesh
Cell: +88 01767-449248
E-mail: safebio2011@gmail.com, www.sbpl-bd.com

কান নিয়েছে চিলে, ডিম খেয়েছে গুজবে

এসিংয়ইং মার্মা, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পেশা: ছাত্রী(মাস্টার্স), ডিপার্টমেন্ট অফ প্যাথোলজি, Mail: marmaashing6@gmail.com; Cell: 01869577479

শামসুর রাহমানের "পন্ডশ্রম" কবিতায় পড়েছি সবাই "কান নিয়েছে চিলে, চিলের পিছে মরছি ঘুরে আমরা সবাই মিলে।" ঠিক তেমনি নকল ডিম নিয়ে সাধারণ জনগণের মাঝে গুজবের শেষ নেই। নকল ডিমের উৎপত্তি নিয়ে মানুষ আসল রহস্যের সন্ধান না করে গুজব ছড়ানোর জন্য ব্যস্ত ছিল। এতে করে সাধারণ জনগণ কিছু সময়ের জন্য অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টিসমৃদ্ধ প্রাণীজ্জ প্রোটিন (ডিম) খাবারের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিল যা খুব স্বল্পদামে আমাদের শরীরের পুষ্টির চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখত।

২০১৭ সালে সোশ্যাল মিডিয়ায় নকল ডিম বানানো নিয়ে ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি

(https://thelogicalindian.com/fact check/plastic-eggs-sell-as-real-fact-check-40558) মানুষের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু "লজিক্যাল ইন্ডিয়ান" নামের একটি ডিজিটাল সংবাদ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এটাই জানা যায় যে, ভাইরাল ভিডিওতে যে প্লাস্টিকের ডিম তৈরি করা হচ্ছে তা আসলে বাচ্চাদের জন্য তৈরি খেলনা ডিম। ভিডিওটি ২০১৭ সালে প্রাথমিকভাবে ভাইরাল হওয়ার পর চীনা নিউজ পোর্টাল এবং FSSAI (Food Safety and Standard Authority of India) যৌথভাবে এর আসল রহস্য উৎঘাটন করা হয়েছিল। তাদের দেয়া তথ্যমতে, "পুরো ডিমের উৎপাদন সম্পূর্ণ করার জন্য কোনও প্রযুক্তি বা রাসায়নিক উপাদান নেই। এছাড়াও, সাধারণ ডিম প্রচুর পরিমাণে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যায় বলে এটি অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর প্রক্রিয়া নয়।"

ডেইলি স্টার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৭ সালে চট্টগ্রামের পটিয়ায় অভিযান চালিয়ে নকল ডিমের ব্যবসা ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত সন্দেহে দুজনকে আটক করেছিল পুলিশ। কিন্তু বিএফএসএ (Bangladesh Food Safety Authority) এর সদস্য মাহবুব কবির ঢাকা ট্রিবিউনকে বলেন, বাংলাদেশে কৃত্রিম ডিম বিক্রি করা সম্ভব নয়। তিনি বলেছিলেন, "একজন মুরগি খামারি গড়ে একটি ডিম বিক্রি করেন ৪-৫ টাকায়, যা বাজারে বিক্রি হয় ৮ টাকায়। একটি কৃত্রিম ডিম, যদি থাকে তবে তা তৈরি করতে আরও বেশি খরচ হবে।"

সুতরাং, বাংলাদেশের নকল ডিম তৈরী করার প্রশ্নই আসে না। নকল ডিম বানাতে যে পরিমাণ পরিশ্রম, সময় এবং আর্থিক খরচ হবে তাতে কোন খামারি বা ফুড ফ্যাক্টরি এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিবে না। আমাদের দেশে যে পরিমাণ ডিম উৎপাদন হয় তা জাতির সর্বস্তরের জনগণের জন্য যথেষ্ট এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণেও সক্ষম।

এবার ডিমের কিছু উপকারিতা জেনে নেওয়া যাক:

১. ডিম ওজন নিয়ন্ত্রণ করে।
২. ক্যান্সার প্রতিরোধ ও শরীর গঠনে সাহায্য করে।
৩. ডিম কোলিন ও জিংকের উৎস।
৪. চোখের অন্ধত্ব দূর করে।
৫. ডিমে থাকা সালফার চুল ও নখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এবং ফসফরাস হাঁড় ও দাঁত মজবুত রাখে।
৬. ডিম কোলেস্টেরল বাড়ায় না। একজন পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষ দৈনিক গড়ে ৩০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত কোলেস্টেরল গ্রহণ করতে পারে। আর একটি ডিমে রয়েছে মাত্র ২০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল। তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, এনডিটিভি।
৭. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।
৮. ডিমেনশিয়া ও আলঝেইমার্স প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।
৯. রক্তচাপ, স্ট্রোক ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

ডিমের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়েও ধারণা থাকা উচিত।

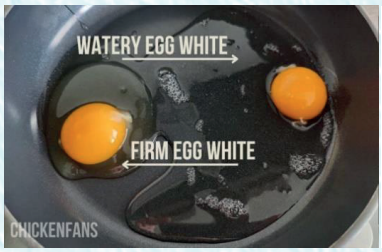
১. ডিমের নির্দিষ্ট একটা আকৃতি থাকে যা হলো ডিম্বাকার। এর এক পাশ সরু বা চিকন এবং অন্য পাশটি গোলাকার। এজন্য ডিমের ট্রে গুলোও এমনভাবে বানানো হয় যাতে করে সরু অংশটি ট্রে এর নিচের দিকে রাখা যায়। আবার প্রশস্ত বা গোলাকার অংশটি থাকবে উপরের দিকে। মূলত এই গোলাকার অংশে বায়ুকোষ থাকে বলে উপরের দিকে রাখা হয়। এই বায়ুকোষ ও খোসার উপরে থাকা অনেকগুলো ছোট ছোট ছিদ্রগুলো ডিমের ভেতর ও বাহিরে বাতাস আদান প্রদান করতে সাহায্য করে। ডিম যত পুরনো হবে বায়ুকোষ তত বড় হতে থাকে।
২. ডিম ক্যালসিয়াম কার্বনেট সমৃদ্ধ শক্ত খোসা দ্বারা আবৃত যা ভেতরের অংশকে বাইরের প্রতিকুল অবস্থা থেকে রক্ষা করে। ডিমের খোসা একটু অমসৃণ এবং খসখসে থাকে। যেটার দ্বারা বুঝা যায় ডিমটি নতুন এবং ফ্রেশ।
৩. ডিমে থাকে কুসুম এবং অ্যালবুমিন বা সাদা অংশ। কুসুমের চারদিকে ঘিরে থাকে অ্যালবুমিন যেটি কুসুমের চেয়ে পাতলা এবং প্রসারিত থাকে।

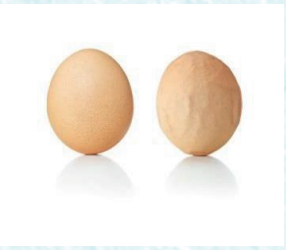
৪. চালাজা নামের একটি সর্পিল আকারের টিস্যু কুসুমকে দুইপাশ থেকে শক্ত করে ধরে রেখেছে বিধায় কুসুম অ্যালবুমিনের মাঝেই থাকে। এমনকি খোসা ভাঙার পর ও কোন দিকে ছুটে যায় না।

৫. সাধারণ ডিমের ওজন গড় ওজন ৫০-৭০ গ্রাম হয়। তবে দেশী মুরগীর ডিম ওজনে আরো কম এবং আকারেও ছোট হয়।

৬. মুরগীর ডিম দুই ধরণের পাওয়া যায়। একটি সাদা, অন্যটি বাদামি ডিম। তবে এদের মধ্যে পুষ্টি উপাদান এবং গুণাগুণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শুধু রং টাই আলাদা হওয়ার কারণে মানুষ নিজের পছন্দ অনুযায়ী ডিম কিনে থাকে।

এত ভালো গুণাগুণ থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ ডিম কিনতে গিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। বাজারে ডিম কিনতে গেলে ডিমের বিভিন্ন ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় যা মূলত বিভিন্ন রোগ বা পুষ্টির অভাবে হয়ে থাকে। যার ফলে মনে হতে পারে আপনি নকল ডিম কিনে ঠকে গেছেন। যেমন: মাঝে মধ্যে দেখা যেতে পারে ডিমের সাদা অংশটা পাতলা এবং পানির মত হয়ে যায়। এমনকি খোসাও পাতলা হয়ে যায় যা ইনফেকশিয়াস ব্রঙ্কাইটিস নামক রোগের কারণে হয়ে থাকে।





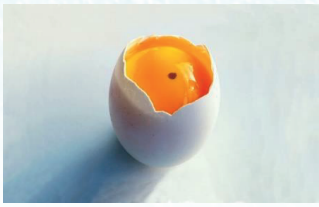
আবার ডিমপাড়া মুরগীর রাণীক্ষেত রোগ হলে ডিমের আকার আকৃতির পরিবর্তন হয়। এছাড়াও এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইনফেকশিয়াস ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত ডিম খোসাবিহীন ও হতে পারে।

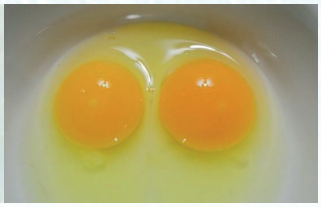




বিভিন্ন রোগের কারণে ডিমের ত্রুটি হলেও চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ ডিম ভালোমতো সিদ্ধ করলে জীবাণুগুলো মরে যায়। বিদেশে অধিকাংশ মানুষ হাফ বয়েল ডিম খেয়ে থাকে তাই জীবাণু দ্বারা নানা রোগ সংক্রমণ হওয়ার সুযোগ থাকে।

অন্যদিকে ক্যালসিয়ামের অভাবে ডিমের খোসা পাতলা হয়ে যায়। তখন কি আপনি ডিমটাকে নকল ডিম বলবেন? ডিমের কুসুমে মাঝেমধ্যে রক্তবিন্দু দেখা যেতে পারে। এটি কোন সমস্যা না।





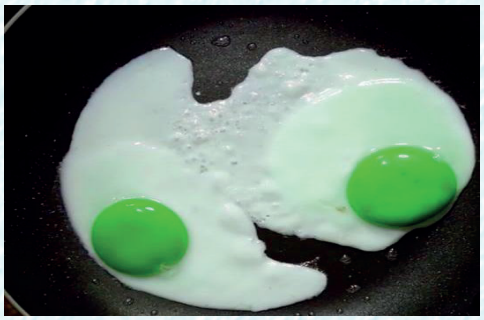
মুরগীর ডিম তৈরীর সময় ডিম্বনালির কোন জায়গায় আঘাত পেলে রক্ত বের হয়ে আসে যার ফলস্বরূপ কুসুমে রক্তবিন্দু দেখা দেয়। এছাড়া ডিমের কুসুম একটির বদলে দুইটি ও পাওয়া যেতে পারে। যেটি কোষ বিভাজনের ত্রুটির কারণেও হতে পারে। বরং দুটি কুসুম থেকে আপনি বেশি পুষ্টি পেতে পারেন। কুসুমের রং গাঢ় কমলা অথবা হালকা হলুদ রঙের হতে পারে। কুসুমের রঙের ভিন্নতা হলেও এটি নকল ডিমের তালিকায় পড়বে না।

কারণ কুসুমের রং নির্ভর করছে ক্যারোটিনয়েড নামক রঞ্জকের উপর যেটি মুরগীকে দেওয়া হয় এমন কিছু খাদ্য উপাদান যেমন ভুট্টা, আলফা মিল, গম, বার্লি এসবে পাওয়া যায়। কুসুম হলুদাভ সাদাও হতে পারে যদি মুরগীকে কম ক্যারোটিনয়েডসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানো হয়। বিভিন্ন বিদেশী ফুডব্লগ ভিডিওগুলোতে দেখবেন কুসুমের রং অধিকাংশে কমলা হয় যার কারণ খাবারে প্রাকৃতিকগতভাবে বেশি পরিমাণে ক্যারোটিনয়েডের উপস্থিতি অথবা খাবারের সাথে ফিড এডিটিভস হিসেবেই দেওয়া হয় এই ক্যারোটিনয়েড । এরকম একটি এডিটিভস হলো carophyl । যা হলুদ ও লাল এই দুই ধরনের পাওয়া যায়।

কুসুমের রং হলুদ বা কমলা হিসেবে পাওয়ার জন্য এটি বিভিন্ন অনুপাতে ফর্মুলেশন করে খাবারের সাথে খাওয়ানো হয়। এটি DSM কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট যার কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া নেই। নিচে একটি প্রচারপত্রে দেখানো হলো।



মুরগীর সবুজ রঙের কুসুমযুক্ত ডিম দেওয়ার কথাও আমরা সবাই জানি। এমনই একটা ঘটনা ঘটেছে ভারতের কেরালা রাজ্যের মালাপ্পুরমের একটি পোল্ট্রি ফার্মে যেটির মালিক এ কে শিহাবুদ্দিন। কেরালার ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা গবেষণার জন্য তার খামার থেকে একটি মুরগী ও কিছু ডিম নিয়ে আসে। গবেষণা করে বুঝতে পারলেন মুরগীগুলো বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ খেয়ে থাকতে পারে যার ফলস্বরূপ কুসুম সবুজ রঙের হয়েছে। (তথ্যসূত্র: jagonews24.com)



অর্থাৎ কুসুমের রঙের ভিন্নতা কোন নকল ডিমের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে না। সুতরাং, আপনি নিশ্চিন্তে বুঝে নিতে পারেন যে আপনি আসল ডিমই খাচ্ছেন। শুধু ডিম কেনার সময় আপনি ডিমের ত্রুটিগুলো বিবেচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে কিনবেন:

১. ডিম পরিষ্কার হতে হবে।

২. ডিম্বাকার হতে হবে।

৩. কেনার পর ফ্রিজে না রেখেও ৭ দিন প্রাকৃতিক পরিবেশে রেখে খেতে পারেন।

৪. ডিম নষ্ট কিংবা ভাল তা যদি বুঝতে চান, পানিতে দুটো ডিম রেখে দেন। যেটি ভেসে থাকবে সেটি হলো নষ্ট বা পঁচা ডিম। আর যেটি ডুবে যাবে সেটি ভালো ডিম।

ডিমের প্রোটিনের শক্তি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষের টিস্যু তৈরিতে যে পরিমাণ অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার পড়ে, এর সঠিক মিশ্রণ আছে ডিমের প্রোটিনে। মানুষের পুষ্টির জন্য মায়ের দুধের পরপরই ডিমকে রাখা হয়। ডিমের চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে চলেছে। দেশে চাহিদার তুলনায় ডিমের সরবরাহ বেশি রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেখানে বড় বড় প্যারেন্ট স্টোক, লেয়ার ফার্মগুলোতে এত ডিম উৎপাদিত হচ্ছে সেখানে মানুষ এত কষ্ট করে কেন নকল ডিম বানানোর পেছনে সময় ও অর্থ খরচ করবে?

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, দেশে গত ১০ অর্থবছরে ডিম ও দুধ উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশে ডিমের উৎপাদন ছিল ১ হাজার ১৭ কোটি, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে এসে বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৩৩৮ কোটি। পাশাপাশি সরকার দেশের ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতসহ একাধিক দেশ থেকে ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছে। তবে পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞদের মতে, এক্ষেত্রে বড় বড় খামারিদের লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকলেও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারিদের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এবং সাধারণ জনগণকেও বেশি দামে ডিম কিনতে হবে।

পরিশেষে বলতে হয়, আসুন, গুজবে কান দিয়ে প্রতারণার শিকার না হয়। ডিম ছাড়া সুন্দর স্বাস্থ্য ও জীবন গড়ার কোন বিকল্প উৎস নেই। ঘরে ঘরে, স্কুলে, হোস্টেল, অফিসে ডিম খেতে উৎসাহ করুন। তবে একসময় যে বলা হতো বেশি ডিম খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর, বিজ্ঞানীরা এখন সে মতবাদ পাল্টে ফেলেছেন। স্বাস্থ্যবান মেধাবী জনগোষ্ঠী গড়তে পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে ডিম খাওয়া দ্বিগুণ করতে হবে। ক্রমাগতহারে ডিম খাওয়ার পরিমাণ বছর বছর বাড়লেও তা সন্তোষজনক নয়। আগামী ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্যবান মেধাবী জনগোষ্ঠী গড়তে পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে ডিম খাওয়ার পরিমান দ্বিগুণ করতে হবে।

মানসিক ও শারীরিক বিকাশে পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের অপরিহার্যতা

প্রফেসর ড. উম্মে সালমা, ডীন, ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

খাদ্য শরীর এর জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী হতে পারে, কিন্তু ভালো খাদ্য হলো আত্মার জন্য জ্বালানী স্বরুপ। আর এই জ্বালানীর উৎস হলো আমাদের প্রাণীসম্পদ। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠির চাহিদামত আমিষের সাথে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের (খনিজ, ভিটামিন, চর্বি) সামঞ্জস্যতা বিধানে প্রাণীসম্পদ খাত থেকে প্রাপ্ত ডিম, দুধ ও মাংসের গুরুত্ব আমরা কতটুকু অনুধাবন করতে পারি তার জন্যই এই লিখার অবতারণা।

এই তথ্যের আলোকে আমাদের উপলব্ধির জগতটাকে একটু ঝালাই করে নিয়ে আমরা যদি এই খাদ্য উৎসের পুষ্টিমানের দিকে একটু নজর দেই; যেমন দুধ, মাংস, ডিম অপরিমেয় পুষ্টির উৎস। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষিজ জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬ দশমিক ৫২ শতাংশ এবং জাতীয় দেশজ উৎপাদনে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১ দশমিক ৮৫ শতাংশ। জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ ও ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। দেশের প্রাণিজ আমিষের ৭০-৭৫ শতাংশ আমিষ এ প্রাণিসম্পদ খাত থেকে সরবরাহ হয়ে থাকে।

একটি নবজাত ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই তার পুষ্টির চাহিদা পূরণে, তার খাদ্যের সবটুকু চাহিদা পূরণ করে দুধ। শুভ্র সুন্দর এই খাদ্য উপাদান থেকে আমরা পাই তরল দুধ এবং দুধ হতে উৎপাদিত পণ্য যেমন: দই, ছানা, মিষ্টি, আইস ক্রিম, পনির, ঘি, মাঠা ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য রয়েছে, যা খুবই পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত। দুধ একটি সম্পূর্ণ ও আদর্শ খাদ্য এবং এটি উৎকৃষ্ট আমিষের উৎস। আয়রন ছাড়া সব প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং মিনারেলস দুধে বিদ্যমান। দুধে এল-ট্রিপটোফেন নামক এমিনো অ্যাসিড থাকায় দুধ খেলে ভালো ঘুম হয়। দুধ থেকে তৈরি ইউগার্ট প্রবায়োটিক হিসেবে কাজ করে যা হজম শক্তি এবং শরীরের ইমিউন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এক কাপ দুধে প্রায় ১৪০-১৫০ কিলোক্যালরি শক্তি, ৮-১০ মিলিগ্রাম মানসম্মত ফ্যাট, ৮-১০ মিলিগ্রাম উন্নত প্রোটিন, ১৩-১৫ মিলিগ্রাম শর্করা, ২৪-২৫ মিলিগ্রাম ঝুঁকিবিহীন কোলেস্টেরল, ৯৮-১০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ভিটামিন, মিনারেলস ও অন্যান্য পুষ্টি উপকরণ থাকে।

দুধের পুষ্টির অনন্যতা যেমন আমাদের জন্য গুরুত্ববহ তেমনি ডিম নিয়ে আমাদের অজস্র অনবদ্য লেখনী রয়েছে, যা আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বায়োলজিক্যাল ভ্যেলুতে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ডিমের দিকে । ডিম একটি সম্পূর্ণ নিউট্রিয়েন্ট পিল। ডিমের আয়রন হিম পদ্ধতিতে থাকে বিধায় মানবশরীরের রক্তে হিমোগোবিন তৈরিতে দ্রুত সহায়তা করে। ডিম ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে ও শরীরের ওজন কমায় এবং বুড়িয়ে যাওয়া রোধ করে। চামড়া মসৃণ রাখে এবং ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। ডিম খেলে দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকে। ডিমের স্যাটাইটি ভ্যালু বেশি বিধায় ডিম খেলে পরিতৃপ্তি নিশ্চিত হওয়ার কারণে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ কম হয়ে থাকে। একটি সম্পূর্ণ ডিমে প্রায় ৬ গ্রাম মানসম্মত প্রোটিন, ৫ গ্রাম উন্নত ফ্যাটি অ্যাসিড, ৭০-৭৭ কিলোক্যালরি শক্তি, ১৭৫-২১০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল, ১০০-১৪০ মিলিগ্রাম কোলিন। এছাড়া ফসফরাস থাকে ১৯৮ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ১৩৮ মিলিগ্রাম, জিঙ্ক থাকে ১.২৯ মিলিগ্রাম। এছাড়াও আছে ভিটামিন এ, ডি, ই, বি-১২, আয়রন, কোলেস্টেরল, কোলিন ইত্যাদি।

ডিমে আছে আকাশের মেঘের শুভ্রতা যা এলবুমিন; এলবুমিন-শরীরের ক্ষয় রোধ করে মসৃনতা ফিরিয়ে দেয় আর সূর্যাস্তের রঙের মতো কুসুমে আছে আয়রণ, কলিন, ফলিক এসিড ও ক্যারোটিনের ন্যায় রঞ্জক পদার্থ যা শারীরিক বিভিন্ন রাসায়নিক দৃঢ়তা দিতে অপরিহার্য।

স্বাস্থ্য, সম্পদ, সুখ সাফল্য এসব কিছুই নির্ভর করে প্রাত্যহিক অভ্যাসের উপর। অভ্যাসের সাথে আবার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে খাদ্যাভাস। সেই খাদ্যাভাসের পুষ্টিগুন তথা অভিজাত্যের প্রতীক হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির মাংস। যা আমাদের জন্য অপরিমেয় পুষ্টি তথা রসনবিলাসের জন্য অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। মাংসের মধ্যে রান্না করা মাংস এবং মাংস হতে উৎপাদিত পণ্য, যেমন মিট বল, মিট বার্গার, মিট কাটলেট, চিকেন বার্গার, চিকেন নাগেট, ফ্রাইড চিকেন, চিকেন স্যান্ডউইচ ও অন্যান্য মাংসজাত খাদ্যপণ্য রয়েছে, যা খুবই পুষ্টিকর, উপাদেয় ও স্বাস্থ্যসম্মত। মাংস একটি উচ্চ আমিষের উৎস যেখানে সব অ্যামিনো অ্যাসিড বিদ্যমান। মাংস মানবদেহের অত্যাবশ্যকীয় ভিটামিন ও মিনারেলসের চাহিদা পূরণ করে। বয়স্কদের অস্থি ক্ষয়রোধ ও দুর্বলতা প্রতিরোধ করে। শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও মেধার বিকাশ ঘটায়। প্রতি ১০০ গ্রাম মাংসে প্রায় ২২-২৬ গ্রাম মানসম্মত প্রোটিন, ৩-৪ গ্রাম উন্নত ফ্যাট, ১৪০-১৫০ কিলোক্যালরি শক্তি, ৭০-৭৫ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল, ৫৫-৬০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ভিটামিন, মিনারেলস ও অন্যান্য পুষ্টি উপকরণ থাকে।

প্রাণিজ আমিষ শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও মেধার বিকাশ ঘটায়, মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, বয়স্কদের অস্থি ক্ষয়রোধ ও দুর্বলতা প্রতিরোধ করে, স্ট্রোক, হৃদরোগ, আর্থ্রাইটিস ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়, মানবদেহের ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, রক্তের ক্ষতিকর ট্রাইগিসারাইডের উপস্থিতি হ্রাস করে, মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে ও সুস্থ সবল মেধাবী জাতি গঠনে সহায়তা করে।

স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে এনক্যাপস্যুলেটেড প্রোবায়োটিক-এর গুরুত্ব

মোঃ মাহফুজুর রহমান, গবেষণা সহকারী, বায়ো-ন্যানোটেকনোলজি এন্ড ন্যানো-মেডিসিন ল্যাবরেটরি, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-৭০০৩

প্রোবায়োটিক

প্রোবায়োটিক হল জীবন্ত উপকারী ব্যাকটেরিয়া যা ফার্মেন্টেড বা গাঁজানো খাবার যেমন দই বা অন্য কোন খাদ্যের সাথে অথবা সাপ্লিমেন্ট হিসেবেও গ্রহণ করা যেতে পারে। যা সুষম হজমে সহায়তাসহ দেহের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকার প্রদান করে, যার মধ্যে অন্যতম হলো ওজন হ্রাস, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এছাড়াও দেহের মেটাবলিক কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, পাচনতন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্যতা সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং রোগের সাথে সম্পর্কিত।

এনক্যাপস্যুলেশন

এটি এক ধরনের কৌশল যার মাধ্যমে প্রোবায়োটিক বা উপকারী ব্যাকটেরিয়াকে বেশ কিছু উপাদানের মাধ্যমে আবদ্ধ করা হয় যাতে পাকস্থলীর হাইড্রোক্লরিক অ্যাসিড এর প্রভাবেও প্রোবায়োটিক জীবিত থাকে। যার ফলে জীবন্ত প্রোবায়োটিক মানব দেহের গাট বা অন্ত্র পর্যন্ত পৌছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করে তোলে। এভাবে আবদ্ধকৃত প্রোবায়োটিককে এনক্যাপস্যুলেটেড প্রোবায়োটিক বলে।

প্রোবায়োটিক-এর উপকারিতা

প্রোবায়োটিক বা উপকারী কিছু ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের পাচনতন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। আমাদের অন্ত্রের মধ্যে উপকারী ও অপকারী উভয় প্রকার ব্যাকটেরিয়াই রয়েছে এর মধ্যে যখন উপকারীর চেয়ে অপকারী ব্যাকটেরিয়ার মাত্রা বেড়ে যায় সে অবস্থাকে আমরা পাচনতন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্যহীনতা বলে আখ্যায়িত করি। বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গেছে এটি মূলত অসুস্থতা, ওষুধ সেবন যেমন অ্যান্টিবায়োটিক, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণসহ বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে। যার ফলে ডায়রিয়াসহ নানা হজম সংক্রান্ত জটিলতা, অ্যালার্জি, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, স্থুলতা এবং আরও অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। সুতরাং, এসব বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে প্রোবায়োটিক আমাদের দেহে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

অনেক সময় অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণের একটি সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে ডায়রিয়া হয়ে থাকে। এটি ঘটার মূল কারণ হলো অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের ফলে অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে যার ফলে আমাদের পাচনতন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার অভাবে হজমশক্তি ব্যহত হয়। কয়েকটি গবেষণায় অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কিত ডায়রিয়ার ঝুঁকি হ্রাসে প্রোবায়োটিক ব্যবহারের ইতিবাচক প্রমান পাওয়া গেছে। এছাড়াও গবেষকরা দেখেছেন যে প্রোবায়োটিক গ্রহণ করার ফলে সি. ডিফিসিল ইনফেকশন (ডায়রিয়া ও অন্ত্রের একধরনের প্রদাহ) যা ৬০% হ্রাস হয়েছে। তবে অ্যান্টিবায়োটিক ঘটিত ডায়রিয়া ছাড়াও অন্যান্য ধরণের ডায়রিয়া মোকাবেলাতেও প্রোবায়োটিক বিশেষ সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি এর একটি প্রকাশনায় পাওয়া যায় যে, ৩৫ টি গবেষণার একটি বড় পর্যালোচনায় দেখা গেছে প্রোবায়োটিক গ্রহণের ফলে ডায়রিয়ার সময়কাল গড়ে ২৫ ঘন্টা কমেছে। এছাড়াও এমন অনেক গবেষণা প্রমান করেছে যে, প্রোবায়োটিকগুলি ভ্রমণকারীদের ডায়রিয়ার ঝুঁকি কমায়। তবে প্রোবায়োটিকের ধরন এবং ডোজ এর উপর কার্যকারিতা নির্ভর করে যেমন ল্যাকটোব্যাসিলাস র‍্যামনোসাস, ল্যাকটোব্যাসিলাস কেসেই এবং ইস্ট স্যাকারোমাইসিস বোলারডিই সাধারণত ডায়রিয়ার ঝুঁকি কমাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

নিয়মিত প্রোবায়োটিক সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের ফলে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি এর আরও একটি গবেষনায় দেখা গেছে প্রাণী এবং মানব উভয় গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রোবায়োটিক সাপ্লিমেন্ট বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাধির উন্নতি সাধন করে। ১৩টি সায়েন্টিফিক প্রকাশনার পর্যালোচনায় প্রমান পাওয়া গেছে যে, ১-২ মাস ধরে বিফিডোব্যাকটেরিয়াম এবং ল্যাকটোব্যাসিলাস স্ট্রেইন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের ফলে উদ্বেগ, বিষন্নতা, অটিজম, অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার (OCD) এবং স্মৃতিশক্তি উন্নতকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আরও একটি গবেষণায় দেখা গেছে ৭০ জন রাসায়নিক কারখানার কর্মীকে ৬ সপ্তাহ ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়, যারা প্রতিদিন ১০০ গ্রাম প্রোবায়োটিক দই বা প্রতিদিন একটি প্রোবায়োটিক ক্যাপসুল গ্রহণ করার ফলে তাদের সাধারণ স্বাস্থ্য, বিষন্নতা, উদ্বেগ এবং স্ট্রেসের জন্য ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায়।

এছাড়াও অন্য একটি গবেষনায় দেখা যায় যারা প্রোবায়োটিক গ্রহণ করেননি তাদের তুলনায় যারা গ্রহণ করেছেন তারা ৮ সপ্তাহের জন্য প্রোবায়োটিক সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের ফলে হতাশার মাত্রা হ্রাস পায় এবং সি-রিঅ্যাকটিভ প্রোটিন মার্কার (প্রদাহের একটি চিহ্নিতকারী) এর মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

কিছু প্রোবায়োটিক প্রজাতি (স্ট্রেইন) আমাদের হৃদপিন্ডকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। প্রোবায়োটিকগুলি এলডিএল কোলেস্টেরল (ক্ষতিকর) কমানোর মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ হ্রাসে বিশেষ ভুমিকা পালন করে। আবার কিছু ল্যাকটিক অ্যাসিড-উৎপাদনকারী প্রোবায়োটিক (ব্যাকটেরিয়া) অন্ত্রের পিত্তরস ভেঙে কোলেস্টেরল কমাতে সহায়তা করে।

বিগত গবেষণায় দেখা গেছে যে কিছু প্রোবায়োটিক স্ট্রেইন শিশুদের মধ্যে অ্যাকজিমার তীব্রতা কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রোবায়োটিক কিছু পাচনজনিত ব্যাধির লক্ষণ কমাতে সাহায্য করে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আলসারেটিভ কোলাইটিস এবং ক্রোন্‌স ডিজিজ সহ প্রদাহজনিত অন্ত্রের রোগে ভুগছে। গবেষণায় দেখা যায়, বিফিডোব্যাকটেরিয়াম এবং ল্যাকটোব্যাসিলাস স্ট্রেইন থেকে কিছু প্রোবায়োটিক আলসারেটিভ কোলাইটিস এবং ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (IBS) রোগীদের আরোগ্য লাভে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

প্রোবায়োটিক আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। বেশ কিছু গবেষনায় প্রোবায়োটিক ল্যাক্টোব্যাসিলাস ক্রিস্পাটাস মহিলাদের মূত্রনালীর সংক্রমণের (ইউটিআই) ঝুঁকি ৫০% কমতে দেখা গেছে। এছাড়াও প্রোবায়োটিক শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের সম্ভাবনা এবং সময়কাল হ্রাস করে।

প্রোবায়োটিক ওজন এবং পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করে। ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি অব মেডিসিন-এ প্রকাশিত একটি সায়েন্টিফিক প্রকাশনায় প্রমান পাওয়া গেছে, প্রোবায়োটিক বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ওজন কমাতে সাহায্য করে। যেমন, কিছু প্রোবায়োটিক অন্ত্রে খাদ্যের চর্বি শোষণে বাধা দেওয়ার ফলে তা শরীরে সঞ্চিত না হয়ে মলের মাধ্যমে নির্গত হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, সিনবায়োটিক পরিপূরক (প্রোবায়োটিক ও প্রিবায়োটিক-এর মিশ্রন) ইতিবাচক স্বাস্থ্যের সাথে যুক্ত অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াগুলির প্রাচুর্যকে বাড়িয়ে তোলে, বিশেষ করে বিফিডোব্যাকটেরিম এবং ল্যাকটোব্যাসিলাস। এটি অন্ত্রের মাইক্রোবায়োটার সমৃদ্ধি বাড়ায় এবং অন্ত্রে সম্ভাব্য উপকারী মাইক্রোবিয়াল প্রজাতির প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি করে থাকে।

উপসংহার

প্রোবায়োটিক থেকে উপকৃত হওয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো আমাদেরকে জীবিত প্রোবায়োটিক গ্রহণ করতে হবে যা বিভিন্ন ধরণের প্রোবায়োটিকযুক্ত খাবার বা সাপ্লিমেন্ট থেকে পেতে পারি। জীবিত প্রোবায়োটিকগুলি প্রায়শই গাঁজানো দুগ্ধজাত যেমন দই এবং দুধের অন্যান্য পণ্য মাঠা, ঘোল ইত্যাদি খাবারে পাওয়া যায়। এছাড়াও আচারযুক্ত সবজি, টেম্পেহ, মিসো, কেফির, কিমচি, স্যুরক্রুট এবং সয়া পণ্যের মতো গাঁজানোযুক্ত খাবারগুলিতেও কিছু ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া থাকে। আবার ট্যাবলেট, ক্যাপসুল এবং গুঁড়ো হিসাবেও প্রোবায়োটিক খাওয়া যেতে পারে। যাইহোক, তবে একটি লক্ষনীয় বিষয় যে, প্রোবায়োটিকগুলি পাকস্থলির হাইড্রোক্লরিক অ্যাসিড দ্বারা অন্ত্রে পৌঁছানোর আগেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যার কারণে আমরা উদ্দেশ্যমূলক স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হই। আমাদেরকে যদি উপরে আলোচিত কোনো স্বাস্থ্য সুবিধা পেতে হয়, তাহলে মাইক্রো-এনকেপস্যুলেটেডে প্রোবায়োটিক খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এনকেপস্যুলেটেড প্রোবায়োটিকযুক্ত খাদ্য তৈরিতেও ব্যপক গবেষণা চলছে। যেমন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের বায়ো-ন্যানোটেকনোলজি ও ন্যানো-মেডিসিন ল্যাবরেটরিতে প্রফেসর, ড. এ.টি.এম. মিজানুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে একদল গবেষক কোরিয়ান টেকনোলজি ব্যবহার করে মাইক্রো-এনকেপস্যুলেটেড প্রোবায়োটিক দই তৈরিতে সফলতা অর্জন করেছে এবং তা মানউন্নয়নের জন্য ব্যপক গবেষণা চলছে। তবে শেষ পর্যন্ত প্রোবায়োটিক এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন।

খাদ্য পণ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পুষ্টিমান নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষণ প্রযুক্তি

ড. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সহকারী অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজি এন্ড প্যারাসাইটোলজি বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
Mail: 1971bangla@gmail.com; mam1982@sau.edu.bd, Cell: 01715264493

দুধ:

উৎপাদন: দুধ প্রক্রিয়াকরণে দুধ, পনির, দই এবং মাখনের মতো বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করতে, পাস্তুরাইজেশন, সমজাতীয়করণ এবং ক্রিম পৃথকীকরণ জড়িত।

পুষ্টি: দুধ ক্যালসিয়াম, প্রোটিন এবং ভিটামিনের একটি ভাল উৎস। স্বল্প ফ্যাটযুক্ত এবং স্কিম দুধের বিকল্প গুলি তাদের চর্বি গ্রহণের জন্য উপলব্ধ।

গুণমাননিয়ন্ত্রণ: গুণমাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাকটিরিয়া, সোম্যাটিক সেল গণনা এবং দুধের সংমিশ্রণের জন্য নিয়মিত পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়া দূরীকরণের জন্য পাস্তুরাইজেশন অপরিহার্য।

সংরক্ষণ প্রযুক্তি: দুধ সাধারণত পাস্তুরাইজেশন দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়, যার মধ্যে তার পুষ্টির মান বজায় রেখে রোগজীবাণু গুলিকে হত্যা করার জন্য দুধ গরম করা জড়িত। ইউএইচটি<টিএজি ১: চিকিৎসা এবং রেফ্রিজারেশন দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

ডিম:

উৎপাদন: ডিম হাঁস-মুরগির খামার দ্বারা উৎপাদিত হয়। এগুলি সংগ্রহ, পরিষ্কার এবং মান এবং আকারের উপর ভিত্তি করে গ্রেড করা হয়।

পুষ্টি: ডিম ভিটামিন বি^{১২} এবং কোলিন সহপ্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ। কুসুম স্বাস্থ্যকর চর্বি ধারণ করে।

গুণমান নিয়ন্ত্রণ: ফাটল বা অপূর্ণতা সনাক্ত করতে ডিমগুলি ভিজ্যুয়াল পরিদর্শন এবং মোমবাতি সহ মানের চেক করে।

সংরক্ষণ প্রযুক্তি: ডিমগুলি সাধারণত তাদের শেল্ফ জীবন বাড়ানোর জন্য ফ্রিজে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে, খাদ্যজনিত অসুস্থতার ঝুঁকি হ্রাস করতে তাদের পেস্টুরাইজড করা যেতে পারে।

ফসল:

উৎপাদন: ফসল কৃষি সেটিংসে জন্মে। উৎপাদন প্রক্রিয়াতে রোপণ, চাষ, ফসল কাটা এবং ফসল কাটার পরে হ্যান্ডলিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পুষ্টি: ফল, শাকসবজি এবং শস্যের মতো ফসলগুলি প্রয়োজনীয় পুষ্টি, ভিটামিন এবং ডায়েটরি ফাইবার সরবরাহ করে।

গুণমান নিয়ন্ত্রণ: ফসলের জন্য মাননিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলি কীটপতঙ্গ এবং রোগ পরিচালনা, যথাযথ সেচ এবং সর্বোত্তম পরিপক্কতায় ফসল সংগ্রহ করে।

সংরক্ষণ প্রযুক্তি: শস্যগুলি ক্যানিং, হিমশীতল, শুকানো বা পিকিংয়ের মতো পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যেতে পারে. নিয়ন্ত্রিত বায়ুমন্ডল স্টোরেজ এবং কোল্ড স্টোরেজ শেল্ফ জীবন বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

মাছ:

উৎপাদন: সমুদ্র, নদী বা জলজ খামার থেকে মাছ উৎপাদন হয়। প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যে পরিষ্কার, ফিলিটিং এবং প্যাকেজিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পুষ্টি: মাছ প্রোটিন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের দুর্দান্ত উৎস।

গুণমান নিয়ন্ত্রণ: লুণ্ঠন রোধ করতে এবং সতেজতা বজায় রাখতে মাছ অবশ্যই সাবধানে পরিচালনা করতে হবে। গুণমান টিটেক্সচার, গন্ধ এবং রঙের মতো কারণ গুলির দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়।

সংরক্ষণ প্রযুক্তি: মাছ হিমশীতল, ক্যানিং, ধূম বা শুকানোর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। কোল্ড চেইনলজিস্টিক গুলি সামুদ্রিক খাবারের গুণমান বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

মাংস:

উৎপাদন: খাবারের জন্য উত্থাপিত প্রাণী থেকে মাংস পাওয়া যায়। প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যে জবাই, কসাই এবং প্যাকেজিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পুষ্টি: মাংস প্রোটিন, আয়রন এবং বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজ গুলির সমৃদ্ধ উৎস।

গুণমাননিয়ন্ত্রণ: রোগজীবাণু এবং দূষকগুলির জন্য চেকসহ সুরক্ষা এবং গুণমান নিশ্চিত করতে মাংস কঠোর পরিদর্শন করে।

সংরক্ষণ প্রযুক্তি: মাংস রেফ্রিজারেশন, হিমশীতল, নিরাময় বা ক্যানিংয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ভ্যাকুয়াম সিলিং এবং পরিবর্তিত বায়ুমন্ডল প্যাকেজিং সাধারণ পদ্ধতি।

সমস্ত খাদ্যবিভাগের জন্য, পণ্য ব্যবহারের জন্য নিরাপদ কিনা, তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্যসুরক্ষা বিধিমালা এবং মাননিয়ন্ত্রণের মানগুলির কঠোরভাবে মেনে চলা অপরিহার্য, অতিরিক্ত ভাবে সংরক্ষণ প্রযুক্তিতে চলমান গবেষণা এবং উদ্ভাবন, খাদ্যপণ্য গুলির শেল্ফ জীবন বাড়াতে এবং খাদ্যবর্জ্য হ্রাস করতে সহায়তা করে।

ডিম

মোহাম্মদ লোকমান, শিক্ষার্থী, এনিম্যাল সায়েন্স এন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন, ৩য় বর্ষ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : mdlokman839008@gmail.com, মোবাইল: ০১৮৭০৮৩৯০০৮

ভূমিকা:

ডিম হলো মূলত পাখি ও সরীসৃপে নিষিক্ত ডিম্বানুর মাধ্যমে সৃষ্ট জাইগোট। অনেক ধরনের ডিম আমরা দেখতে পাই তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের ভোজন ও সহজলোভ্যতা ও পুষ্টীর গুণাবলি বিবেচনায় মুরগীর ডিম বহুল পরিচিত।

মুরগির শেষ পরিণতি যদি মাংস হয় তবে ডিম হবে আগের ধাপ। মাংস খেলে প্রাণী হত্যা হয় কিন্তু অনিষিক্ত (অর্থাৎ যে ডিমে বাচ্চা হবে না) ডিম খেলে প্রাণী হত্যা হবে না, বাংলাদেশের অনেক নিরামিষাশী শুধু এই যুক্তিতেই ডিম খায়, অনেকে মুরগির ডিম বেশি পছন্দ করেন যেহেতু তার আঁশটে গন্ধ কম।

পুষ্টিগুণ:

ডিম এর কয়েকটি বিশেষ গুনাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো এর পুষ্টিগুন। একটি সাধারণ মুরগির ডিমে প্রোটিন আছে প্রায় ছয় গ্রাম, যাতে রয়েছে মানবদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়টি অ্যামিনো অ্যাসিড। মুরগির ডিমে রয়েছে অতি মূল্যবান ওমেগা-৩, যা হৃৎপিণ্ডকে কার্যকর রাখতে সাহায্য করে। কোলিন ডিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা গর্ভবতী মায়ের মস্তিকজনিত জটিলতা দূরীকরণে সহায়তা করে, গর্ভাবস্থায় শিশুর মেধা ও স্মৃতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ডিমে আছে ফলিক অ্যাসিড অথবা ফোলেট, যা ত্রুটিপূর্ণ সন্তান জন্মদানের ঝুঁকি কমায়। এ ছাড়া রয়েছে সেলেনিয়াম, যা মানুষের মানসিক চাপ কমাতে সহায়তা করে এবং ক্যানসার, বিশেষত প্রোস্টেট ক্যানসার রোধে সহায়তা করে। ডিমে রয়েছে ৫ গ্রাম কোলেস্টেরল, যার প্রায় ৩.৫ গ্রাম উপকারী ও ভালো কোলেস্টেরল, যা মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রমে প্রয়োজন, হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়।

শুধু তাই নয় ডিমের মধ্যে রয়েছে কর্মদক্ষতা এবং উদ্যম শক্তি। ডিমের মধ্যে প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল, এনজাইম এবং অ্যামাইনো এসিড এমনভাবে বিন্যস্ত যে এটা শরীরের সব ধরণের পুষ্টির অভাব পুরণ করে শরীরের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। একটি ডিমে রয়েছে দৈনিক চাহিদা পূরণের উপযোগী ১৫ শতাংশ ভিটামিন-বি। এটি দৈনিক খেলে দেহের ভিটামিন-বি এর চাহিদা মেটাতে ভূমিকা রাখে। ভিটামিন-বি দেহে এনার্জি যোগায়। এ কারণে উদ্যমের প্রয়োজনে ডিম খাওয়ার তুলনা হয় না।

প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WWEDGBPI) পুষ্টিমান অনুসারে, বছরে একজন মানুষকে কমপক্ষে ১০৪টি ডিম খেতে হবে। এর বেশি হলেও ক্ষতি নেই বলে জানিয়েছেন পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা। তবে হ্যাঁ বেশি ডিম ভোজনেও নানান সমস্যা দেখা দেয় অতিরিক্ত কোলেস্টোরল তার মধ্যে অন্যতম।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ডিমের উপকারিতা ও ডিমের সহজলোভ্যতার ফলে চাহিদা সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট ধারনা হয়েছে। তবে অতীত থেকে বর্তমান বাংলাদেশ সবসময় ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল।

ডিম দিবস:

প্রতিবছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার উদযাপিত হয় 'বিশ্ব ডিম দিবস'। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও আজ শুক্রবার (১৪ অক্টোবর) উদযাপিত হচ্ছে দিবসটি। এবারের প্রতিপাদ্য হলো 'প্রতিদিন একটি ডিম, পুষ্টিময় সারাদিন'। ডিম দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর সূত্রে জানা গেছে, ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বর্তমানে বছরে দুই হাজার কোটি ডিম উৎপাদিত হচ্ছে। ২০৪১ সালে এই উৎপাদন সাড়ে চার হাজার কোটিতে পৌঁছাবে।

কিন্তু বর্তমান সময়ে যথেষ্ট উৎপাদন থাকা সত্ত্বেও ডিমের মূল্য বৃদ্ধি একটি জাতীয় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। এর অন্যতম কারন ডিমের সংরক্ষনের পদ্ধতি জানার অজ্ঞতা। ডিমের চাহিদা সবসময় মিটানোর জন্য ডিম সংরক্ষনের পদ্ধতি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ডিমের সংরক্ষন পদ্ধতি

(ক) দেশীয় প্রথায় ডিম সংরক্ষণ: বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবে সাধারণ মানুষরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ করে থাকে। যথা:

১) মাটির হাঁড়িতে ডিম সংরক্ষণ: প্রথমে মাটির হাঁড়ির মধ্যে ডিম রাখা হয়। পরে হাঁড়ির অর্ধাংশ ভেজা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। এভাবে সংরক্ষিত ডিমের মেয়াদ স্বল্পমেয়াদি বিধায় এটি তেমন কার্যকর পদ্ধতি নয়। ঠান্ডায় সহজ পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণের উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলে ঘরের কাঁচা মেঝেতে একটি গর্ত করা হয়।

ঐ গর্তের মধ্যে বসানো হয় একটি মাটির হাঁড়ির। হাঁড়ির চারপাশে কাঠ কয়লা দিয়ে ভরাট করা হয়। প্রতিদিন কয়েকবার পানি দিয়ে কাঠ কয়লা ভিজিয়ে দেয়া হয়। এতে হাঁড়ির মধ্যভাগ বেশ ঠান্ডা হয়ে যায় । হাঁড়ির মধ্যে ডিম রেখে মাটির সরা বা ঢাকনা দিয়ে হাঁড়িটি ঢেকে দেয়া হয়। এভাবে সংরক্ষিত ডিম বেশ কিছুদিন ভালোভাবে টিকে থাকে। ফলে এটিকে ডিম সংরক্ষণের একটি মোটামুটি লাগসই প্রযুক্তি বলা যায়।

২) সিদ্ধ করে ডিম সংরক্ষণ : ডিম সিদ্ধ করে সংরক্ষণ করা যায়। ৬০ক্ক সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম পানির মধ্যে ১৫ মিনিট ধরে ডিম সিদ্ধ করলেও তা বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য রাখা যায়। গ্রামের হাট, ফেরিঘাট, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন প্রভৃতি জনবহুল স্থানে ফেরি করে সিদ্ধ ডিম বিক্রি করা হয়। ১০০ টি সিদ্ধ ডিম একই দিনে বিক্রি না হলে তা পরদিন এবং প্রয়োজনবোধে আরও একদিন পর্যন্ত রেখেও বিক্রি করা হয়। এভাবে সিদ্ধ করার পর অন্তত ২ দিন পর্যন্ত ডিম ভালো অবস্থাতেই থাকে।

৩) ডিমের খোসার ছিদ্র বন্ধ করে ডিম সংরক্ষণ : ডিমের খোসা বা উপরিভাগের আবরণে থাকে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। বাইরের গরম বাতাস এসব ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ডিমের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তা বের হয়ে আসে জলীয় বাষ্প আকারে। এসব ছিদ্র দিয়ে নানা ধরনের অণুজীব প্রবেশ করে ডিমকে পচিয়ে দেয় বা নষ্ট করে । এসব সূক্ষ্ম ছিদ্র খালি চোখে দৃশ্যমান নয়। তবে ডিমের এসব ছিদ্র যদি বন্ধ করা যায় তবে ডিমের ভেতরের গুনাগুণ অপরিবর্তিত থাকে ।

(ক) সরিষার তেল ব্যবহার: ডিমকে ১ মিনিট খাঁটি সরিষার তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে ডিমের খোসার গায়ে ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় । এভাবে তেলে ডোবানো ডিম তুলে স্বতন্ত্র পাত্রে রেখে দিতে হয়। এভাবে রাখা ডিম বেশ কিছুদিন ভালো থাকলেও খাওয়ার সময় ডিমে সরিষার তেলের ঝাঁজ পাওয়া যেতে পারে।

(খ) মিনারেল তেল ব্যবহার: বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদহীন মিনারেল তেলের মধ্যে ডিম ডুবিয়ে পরে তুলে তা শুকিয়ে রাখতে হয়। এভাবে তেলে ডুবিয়ে পরে শুকানোর ফলে ডিমের মধ্যকার জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হতে পারে না। এভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রথমে একটি পাত্রের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে মিনারেল তেল নিতে হয়। একটি তারের জালের খাচার মধ্যে ভরে নিয়ে খাঁচাটিসহ মিনারেল তেলের মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হয়। তারপর খাঁচাসহ তুলে নিতে হয়। আজকাল আধুনিক পন্থায় ডিমের উপরে মিনারেল তেল উত্তমরূপে স্প্রে করা হয়। তারপর ঐ ডিম প্যাকেট বন্ধ করা হয়। এভাবে ডিম সংরক্ষিত থাকলেও ব্যবহৃত মিনারেল তেলে যদি কেন গন্ধ বা স্বাদ তবে তা ডিমের মধ্যে প্রবেশ করে ।

(গ) চুনের পানি ব্যবহার: কোথাও কোথাও চুনের পানির মধ্যে ডিম ডুবিয়ে রেখে পরে তা সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে চুনের পানিতে ডুবিয়ে রাখলে ডিমের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে সংরক্ষিত ডিম দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ভালো অবস্থায় থাকে। এভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রথমে একটি পাত্রে ১ লিটার পানি নিতে হয়। পানিতে ১০০ গ্রাম লবণ ভালোভাবে গুলে তারপর গরম করতে হয়। লবণ মেশানো পানি চুলা থেকে নামিয়ে রাখতে হয়। ঐ পানি ঠান্ডা হওয়ার পর তার মধ্যে ২৫০ গ্রাম চুন উত্তমরূপে গুলে নিতে হয়। এরপর পাত্রটি ১ দিন রেখে দিতে হয়। পাত্রের নিচে তলানিতে জমে। ওপরের পরিষ্কার পানি আরেকটি পাত্রে এমনভাবে ঢেলে নিতে হয় যাতে নিচের তলানি নড়ে না যায়। এরপর ঐ পরিষ্কার পানির মধ্যে তারের খাঁচাসহ ডিম ডুবিয়ে দিতে হয়। খাঁচাসহ ডিম তুলে ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে দিলে ডিম শুকিয়ে যায়। ডিম সংরক্ষণের জন্য এটি একটি সহজ উত্তম পদ্ধতি।

উন্নত পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ (Preserve eggs in an improved manner):

১) হিমাগারে সংরক্ষণ: বাচ্চা ফুটানোর জন্য ডিম হিমাগারে ১ সপ্তাহ সংরক্ষণ করা হয়। হিমাগারে তাপমাত্রা রাখা হয় ১২ক্ক সেলসিয়াস। খাবার খাবার ডিম সংরক্ষণের জন্য হিমাগারের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা রাখতে হয় যথাক্রমে ০-৩ক্ক সেলসিয়াস ও ৬০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

২) গভীর সংরক্ষণ ডিমঃ এ পদ্ধতিতে ডিম ভেঙে ভেতরের কুসুম ও সাদা অংশ ০ক্ক সেলসিয়াস বা তার চেয়েও কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বেকারি, কনফেকশনারি এবং ন্যুডলস্ তৈরির কারখানায় ব্যবহারের জন্য এভাবে ডিম সংরক্ষণ করা হয়।

ডিম শুকানোর পদ্ধতিসমূহঃ

৩) শুকনো ডিম:

(ক) ডিম ভেঙে ভেতরের তরল কুসুম ও সাদা অংশ "ক্ল্যারিফায়ার" যন্ত্রের মধ্যে দেয়া হয়।

(খ) ছাকনির সাহায্যে ডিমের চ্যালাজা এবং ভাইটিলিন পর্দাসমূহ আলাদা করে ফেলা হয়।

(গ) তারপর ৬০ক্ক সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উষ্ণ বাতাস ডিমের জলীয় অংশ শোষণ করে নেয় এবং ডিমের গুঁড়ো পাউডার হয়ে যায়। এভাবে শুকানো পাউডারকৃত গুঁড়ো ডিম অবিলম্বে প্যাকেটবন্ধি ও সীলমোহর করতে হয়। বাতাসে কিছুক্ষণ থাকলে ও ডিম বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারে।

অনেক সময় ডিমের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্যাকেটে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করা হয়। এভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করা হলে তা ডিমের মধ্যে অণুজীবের প্রবেশ এবং বংশ বিস্তার রোধ করে । প্যাকেটজাত গুঁড়োয় ২% এর অধিক আর্দ্রতা থাকা অনুচিত।"

ডিম উৎপাদন :

বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী ডিম উৎপাদন হচ্ছে না তবে এর অন্যতম কারন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে পশ্চাতপদতা। যেমন আভ্যন্তরীণ গুণনির্ণয়-ভিত্তিক ডিমের বাছাই, পোল্ট্রি ওয়েলফেয়ার, ডিম ও মুরগি উৎপাদন ব্যবস্থায় তথ্যবিজ্ঞানের অভাব ইত্যাদি। প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে, বিভিন্ন সেন্সিং সিস্টেম ব্যবহার করে ডিমের অভ্যন্তরীণ ও পুষ্টি উপাদান, উর্বরতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ডিমের গ্রেডিং করা যেতে পারে। প্রযুক্তির ব্যবহার পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে।

প্রযুক্তির এই যুগে, আমরা আমাদের পোল্ট্রি খাতে উন্নত প্রযুক্তির (যেমন অটোমেশন, অপ্টিকাল সেন্সিং এবং ইনফরমেটিভ) প্রবর্তন এবং গ্রহণ না করে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কিংবা দেশীয় বাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রযুক্তির ব্যবহার কম খরচে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজারে ডিম ও পোল্ট্রি পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে।

শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির ধারণা মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে এখন আর আমাদের চলবে না, যা এখন অতীত। আমাদের জৈব নিরাপত্তা (বায়ো সিকিউরিটি) ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে অটোমেশন এবং স্মার্ট ফার্মিং সিস্টেম (শিল্প বিপ্লব ৩-৪) এর চিন্তা করতে হবে। স্মার্ট পোল্ট্রি ফার্মিং মানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ (AI) যা প্রযুক্তি এবং সিস্টেমকে বোঝায় যা বিভিন্ন ডিভাইসকে কম্পিউটারে মানুষের মতো জটিল সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, অসুস্থতা এবং মৃত্যুহার হ্রাস, রোগের সূত্রপাত এবং বিস্তারের সম্ভাবনা হ্রাস, পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস, স্থান এবং অন্যান্য ইনপুটগুলির দক্ষ ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, আমরা এখন আর চাহিদা মেটাতে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নেই।

উপসংহারঃ

আমাদের বর্তমান ও নতুন প্রজন্মের জন্য সুস্থ ও সমৃদ্ধ জীবনযাপনের জন্য পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার কথা ভাবতে হবে। আর এ জায়গাটায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। পোল্ট্রি শিল্পের দ্রুত উন্নতি ও বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রযুক্তিকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের খামারির বড় একটা অংশ গ্রাম পর্যায়ের, এ খাতে কিভাবে প্রযুক্তিগুলি প্রান্তিক পর্যায়ে পৌছনো যাবে সে বিষয়ে সবাইকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে ভাবতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে এবং কাজ করতে হবে।

উল্লেখঃ বোল্ডস্কাই, কৃষি তথ্য সার্ভিস (এ এস আই) , প্রথম আলো ২৩ এপ্রিল ২০২৩



Food Safety and Public Health Concern in Bangladesh

Dr. Zakiah Rahman Moni, Principal Scientific Officer (Nutrition), Bangladesh Agricultural Research Council

Along with agriculture, food safety and nutrition is the indispensable part of food security, general health and well-being. To address this threat, Government of Bangladesh's (GoB) efforts to develop a transparent, efficient policy and regulatory environment for food safety. Ensuring enough safe food for ever growing population under resource declining condition due to global warming is a huge challenge.

Food Safety

Food Safety is a scientific discipline deals with preparation, storage and handling of food in ways that prevent food borne illness. Food safety, nutrition and food security are indissolubly allied. Access to adequate quantities of safe and nutritious food is key to sustaining life and promoting good health. Four steps of food safety are,

- Clean-Wash hand, surfaces and fruits and vegetables
- Separate- Don't cross contaminate
- Cook-Cook to safe temperature
- Chill-Refrigerate promptly

Food Safety is a multi-disciplinary field and it has a lots of a consequences in human health as well as environment and entire ecosystem. Now a day's food safety is a major concern and challenges in Bangladesh. Contaminated food supply, little control of raw materials, lack of effective management in supply chain, unsafe food processing and preservation technic, poor personal hygiene or unaware of hygiene, inadequate quality control, and unsafe water are the major challenges of food safety and public concern in Bangladesh. People of this country is not aware about the relationship food safety and economic loss. A remarkable people are living in slum with the compromising of limited opportunity. The situation is exacerbated because slum dwellers are exposed to poor environmental condition (i.e., overloading, poor quality drinking water, hygiene, and no removal of waste), low health care use, poor diet, and lack of nutritional knowledge. It is essential for ensuring safe food for consumption and for preventing foodborne illnesses because diseases that may not be lethal, may be associated with considerable physical and emotional suffering, resulting from disability associated with the illness affecting quality of life. By the application of Quality Adjusted Life Years (QALY), Disability Adjusted Life Years (DALY) in the realm of Public Health enables policy makers to make informed decisions, and countries to choose vital, cost-effective health solutions which may indicate the economic loss of a country.

Food Quality and Food Standards is mandatory to ensure safe food. Food standards are something that are set by experts or an authority for measuring quantity, weight, extent, value and quality of a substance. Codex Alimentarius commission is the principle organization of the worldwide food standards program set by FAO and WHO. The purpose of Codex Alimentarius are,

- To present internationally accepted food standards in a uniform manner
- To protect consumers health
- To educate consumers
- To assist harmonization
- To make international trade easy

Bangladesh Food Safety Authority (BFSA), Ministry of Food (MoF), is established to coordinate all these agencies and suppose to work as an umbrella organization. To make a science-based food safety policy affairs more efficient and effective, the Policy Activity has engaged a diverse set of stakeholders in identifying key policy and regulatory constraints to food production, import, processing, stock, supply, marketing, and sales, so that the rights toward access to safe food can be ensured through appropriate application of scientific process.

Institutions Involved in Food Safety in Bangladesh

Primary Production	Secondary Production/ Processed Food	Domestic Marketing and Distribution	Import-Export
• DAE • DLS • DOF	• DOF • BSTI • BFSA • DGHS • LGD	• DOF • DGHS • LGD • BSTI • DNCRP	• DAE • DLS • DOF • BSTI • BFSA • Custom Authority

Abbreviations: BFSA: Bangladesh Food Safety Authority; BSTI: Bangladesh Standards and Testing Institution; DAE: Department of Agricultural Extension; DGHS: Directorate General of Health Services; DLS: Department of Livestock Services; DNCRP: Directorate of National Consumer Rights Protection; DOF: Department of Fisheries; LGD: Local Government Division.

Food Safety Threats in Bangladesh

The major food safety is threat is related to Public health, Agriculture and Food System. Those directly distresses on trade, income & purchasing power, productivity and consumer confidence. Safe food supplies support national economies, trade and tourism, contribute to food and nutrition security, and underpin sustainable development. Urbanization and changes in consumer habits have increased the number of people buying and eating food prepared in public places. Globalization has triggered growing consumer demand for a wider variety of foods, resulting in an increasingly complex and longer global food chain. Climate change is also predicted to impact food safety. These challenges put greater responsibility on food producers and handlers to ensure food safety. Local incidents can quickly evolve into international emergencies due to the speed and range of product distribution. Food handlers and consumers need to understand how to safely handle food and practicing the WHO five keys to safer food at home, or when selling at restaurants or at local markets. Food producers can safely grow fruits and vegetables using the WHO Five keys to growing safer fruits and vegetables. The improvement tools of accountability by proper monitoring, look for ways to improvement, enforcement of different acts & laws, clear roles and responsibilities, consequences are understood, knowledge & Action by training, rewards, Prevent future problems. Finally, if the food is not safe, it is not food.

Way forward:

- Modern food habits such as preservation, packaging and modification of food products has given rise to concerns of contamination, adulteration and food borne diseases.
- Ensuring food safety is of immense importance in the modern times.
- To ensure food safety, procurement, handling, preparation, packaging, storage and inspection of food in a proper way is necessary and all of these are provided by different stakeholders.
- Ensure Good Agricultural Practices (GAP), Good Hygienic Practices (GHPs), and the Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
- Mass scale training need to be organized up to field level.
- National monitoring cell need to be developed.
- Adequate funding as well as International collaboration is required.
- Strengthening communication, coordination, and cooperation among institutions (e.g. research firms, think tanks, and universities) for more effective and accelerated policy implementation.
- Increasing effect of local actors and communities to affect food security policy and governance decisions.
- Promoting greater participatory policy learning and knowledge sharing practices at national and sub-national levels.

Eggs for a healthy future

A theme of World Egg Day 2023

This year's World Egg Day theme 'Eggs for a healthy future' celebrates the nutritional power of the incredible egg and its potential to combat common nutrient deficiencies across the world.

The remarkably versatile egg contains 13 essential nutrients in one delicious package.

As well as its abundant nutritional merits, the egg is one of the most environmentally sustainable and cost-effective animal-source proteins available.

We hope that this year's theme will encourage everyone, no matter your location, market or specialism, to celebrate the unique power of the egg.

Key messages

Nature's nutrient hero

Containing a wide range of essential nutrients and vitamins in one affordable and delicious package, eggs can play a pivotal role in eradicating common nutrient deficiencies.

Among the most common nutrient deficiencies worldwide are iron and vitamin D, A and B^{12}– all of which can be found in eggs.

Many of the nutrients found in eggs are commonly under-consumed yet are required as part of a healthy diet to help optimise performance and avoid serious health issues.

The high nutrient density of eggs enables them to support the body's natural immune system, advance physical growth and aid child brain development.

Eggs have the capacity to directly improve human health outcomes across the world, contributing to a healthy future for all, thanks to the bioavailability of their nutrients.

The perfect protein

Eggs contain all 9 amino acids, making them a 'complete' protein. The ratio and pattern of amino acids in eggs makes them the perfect match for the body's needs.

Eggs provide one of the highest quality proteins naturally available.

The protein in eggs helps to build muscle, curb hunger, boost the immune system and much more.

Egg-cellent versatility

Eggs are a healthy and accessible source of nutrition for people at all stages of life, including teenagers, expecting mothers, infants and the elderly.

Due to their outstanding versatility, eggs can be enjoyed as an ingredient or the centre of a dish, for any mealtime throughout the day.





বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিমূল্য

রোকসানা আমিন, বিআইএইচএস জেনারেল হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকা

আমরা খাবার খাই ঠিকই কিন্তু কোন খাবারে কি পুষ্টি রয়েছে বা কোন খাবারের সাথে কি খেলে পুষ্টিমূল্য বৃদ্ধি পাওয়া যায় তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। সঠিক ভাবে জানা থাকলে আমরা সঠিক পুষ্টি পেতে পারি।

সকল খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে প্রথম হচ্ছে খাদ্য শস্য। খাদ্য শস্য বলতে যা বুঝায় তা হল চাল,গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি। এসকল খাদ্য শস্যের বিশেষ করে চালের লাইসিন নামক অ্যামাইনো এসিড এর অভাব থাকে। লাইসিন ভালো পাওয়া যায় প্রোটিন মুক্ত খাদ্য যেমন ডাল, দুধ, মাছ। তাই শস্য কণার সাথে এই সকল খাবার মিক্স করে রান্না করলে Lysine এর অভাব পূরণ হয় এবং Protein এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

গমের মধ্যে আটাতে বেশি প্রোটিন বি-ভিটামিন এবং ম্যাঙ্গানিজ থাকে। এছাড়া আরও দুটি প্রোটিন গাইয়াডিন ও গুটেনিন থাকে। এই দুটি প্রোটিনকে একত্রে বলে গুটেন।

ময়দা বেশি ছাটার কারনে যেলুলোজ ও ফাইটেজ কম থাকে। ফলে বি-ভিটামিন ও প্রোটিন কমে যায়। শ্বেতসার বেড়ে যায়।

ডাল ঃ ডালে মেথিওনিন নামক অ্যামাইনো এসিডের ঘাটতি থাকে। তাই খাদ্য শস্যের সাথে গরীবফ করে খেতে হয়। তাই চাল-ডাল খিচুরি করে খেলে প্রোটিনের মান বৃদ্ধি পায়। কারন খাদ্য শস্যে মেথিওনিন ভালো পরিমানে থাকে। এছাড়া ডালে ভালো পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ফসফরাস এবং বি-ভিটামিন পাওয়া যায়। কাঁচা ডালে Goiter উৎপাদনকারী পদার্থ পাওয়া যায় ইহা গলগন্ড রোগ সৃষ্টি করে এবং মসুরির ডালে ল্যাথারিজম নামক রোগ হয়।

মাছ ঃ মাছে প্রচুর প্রোটিন থাকে। তৈলাক্ত ও সামুদ্রিক মাছ, বড় মাছে প্রচুর ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' পাওয়া যায়। মিনারেলস এর মধ্য কপার ও আয়োডিন উল্লেখযোগ্য। বড় মাছের যকৃত বিশেষ করিয়া সামুদ্রিক মাছ, কড ও হ্যালিবাট মাছের যকৃত ভিটামিন 'এ' ও 'ডি'এর ভালো উৎস। এছাড়া ছোট মাছ থেকেও আয়োডিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পেতে পারি।

মাংস ঃ মাংসে প্রচুর প্রোটিন, আয়রন ও ফসফরাস পাওয়া যায়। ফ্যাটের এর মধ্যে ফসপো লিপিড ও কোলেস্টেরল উলেখযোগ্য। মাংসের যে আঁশ থাকে তাকে 'Striated Fiber' বলে।

ডিম ঃ পাশ্চাত্য দেশের চাইতে আমাদের দেশের ডিমের ওজন অনেক কম, অনেক ছোট। এর সাদা অংশে প্রচুর পানি রয়েছে এবং এর সবটাই Protein। বিশেষ করে অ্যালবুমিন এর পরিমান অধিক। এতে ফ্যাট ও মিনারেল খুব অল্প থাকে।

ডিমের কুসুমে প্রচুর ফ্যাট, মিনারেল ও প্রোটিন থাকে। মিনারেলস এর মধ্যে কালসিয়াম, ফসফরাস ও আয়রন বেশি থাকে। হাসের ডিম ও মুরগির ডিমে পুষ্টি উপাদানের তেমন কোন পার্থক্য নাই।

দুধ ঃ দুধে প্রচুর কালসিয়াম, ফসফরাস ও প্রোটিন পাওয়া যায়। যা অস্থি গঠনে কাজে লাগে। বি-ভিটামিন ও যথেষ্ট পরিমানে পাওয়া যায়। রিবোফ্লাবিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রচুর ভিটামিন 'এ' ক্যারোটিনয়েড ও 'ডি' পাওয়া যায়। দুধের পরিবর্তে আমরা অনেকেই দই খাই। দই এর পুষ্টি মান দুধের মতই। দুধ অপেক্ষা দধি সহজে পরিপাক হয়। পেটের পিড়া বা বক্ষের কোন অসুখ থাকলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

শাকসবজিঃ এতে প্রচুর খাদ্য আঁশ বা ফাইবার থাকে। আঁশ কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে দেহ কে সুস্থ ও সতেজ রাখে। শাক সবজিতে বিদ্যমান ভিটামিন ই, সি এবং বিটা ক্যারোটিন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। আমাদের দেশে খাদ্য তালিকায় ভাত প্রধান, শাক সবজি গ্রহণ একেবারে ই কম অথচ শাক সবজি গ্রহণের ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যায়। শাকে বিশেষ করে ভিটামিন এ, ই, সি, কেও কয়কে ধরনের বি এর উৎস। এতে প্রচুর ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন ও পটাশিয়াম থাকে।

ফলমূলঃ ফল আমরা রান্না ছাড়া খাই বলে এর ভিটামিন নষ্ট হয়না রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও বৃদ্ধি বিকাশে সাহায্য করে। এতে প্রচুর ভিটামিন ও মিনারেল থাকে যা সুস্থ থাকতে প্রয়োজন। আমাদের দেশীয় ফলে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। তাই খাদ্য নিরাপওায় ফল মানে দেশি ফল। যে ফলের খোসা খাওয়া যায় তা খোসা সহ খেতে চেষ্টা করুন। খোসাতে আরো বেশি পুষ্টি পাওয়া যায়।

মশলাঃ মসলায় প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় খুব সামান্য কিন্তু মিনারেল ও ভিটামিন এর ভাল উৎস বিশেষ করে থায়ামিন, রিবোফ্লাবিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস উল্লেখযোগ্য।

ডিম কি কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়?

তাসনিমা হক, নিউট্রিশনিষ্ট, বিআইএইচএস জেনারেল হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকা

ডিমের পুষ্টি শরীরের বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। বহুমুখী ডিমের জনপ্রিয়তা বাড়ছে দিন দিন। প্রতিদিন সকালের নাস্তায় প্রধানত ডিম, লাঞ্চ, স্ন্যাকস এবং এমনকি ডিনারেও। তবে এই পুষ্টিকর খাবারটি নিয়েও রয়েছে মানুষের মনে নানা দ্বিধা ও প্রশ্ন।

ডিমের সাদা অংশে প্রোটিন, রিবোফ্লাভিন এবং সেলেনিয়াম থাকে, তবে একটি ডিমের পুষ্টির অধিকাংশই কুসুমে পাওয়া যায়।

- ভিটামিন ডি, হাড়ের স্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ডিম একমাত্র খাবার যা প্রাকৃতিক ভাবে ভিটামিন ডি ধারণ করে।
- কোলিন, সমস্ত কোষের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অপরিহার্য, গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের সুস্থ মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- Lutein এবং Eaxanthin, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা ছানি হওয়ার ঝুঁকি কমায় এবং বয়সের সাথে সম্পর্কিত ম্যাকুলার অবক্ষয়ের অগ্রগতিকে ধীর করে বলে মনে করা হয়, এটি বয়সের সাথে বিকাশমান একটি রোগ।

আয়রনের ঘাটতি রক্তশূন্যতা সৃষ্টি করতে পারে যখন শরীরে আয়রনের সঞ্চয় ক্ষয় হয়ে যায় যার ফলে হিমোগোবিন সংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, আয়রনের ঘাটতি জনিত রক্তাল্পতা বিশ্বের সবচেয়ে সাধারণ পুষ্টির ঘাটতিগুলির মধ্যে একটি। আয়রনের অভাবের অনেক কারণ রয়েছে যার বেশির ভাগই দুটি শ্রেণীর একটিতে পড়ে

১. আয়রনের চাহিদা বৃদ্ধি দ্রুত বৃদ্ধির কারণে, মহিলাদের গর্ভাবস্থা, রক্তের ক্ষয়

২. আয়রন গ্রহণ বা শোষণ কমে যাওয়া - খাদ্যে 'হিম' আয়রনের উৎসের অভাব

রক্তাল্পতার লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে: ক্লান্ত এবং দুর্বলবোধ করা, স্ট্যামিনার লক্ষণীয় অভাব, মাথা ব্যথা, অনিদ্রা এবং ক্ষুদ্র হ্রাস। এই সমস্ত উপসর্গ টিস্যু এবং অঙ্গগুলিতে অক্সিজেন সরবরাহ হ্রাসের সাথে যুক্ত। আযয়নই মিউন সিস্টেমেও ভূমিকা পালন করে যেসব মানুষের আয়রন কম তাদের সংক্রমণের প্রতরোধ ক্ষমতা কম থাকে। মহিলাদের পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ আয়রন কম থাকে এবং তাদের ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, বিশেষ করে সন্তান জন্ম দানের বছর গুলিতে।

সৌভাগ্যবশত, ডিম আয়রন, প্রোটিন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভিটামিনের একটি বড় উৎস।

একটি বড়, পুরো, কাঁচা ডিমের পুষ্টির তালিকা

ক্যালোরি: ৭৯

চর্বি: ৪.৭৫ গ্রাম

প্রোটিন: ৬২৮ গ্রাম

ফাইবার: ০ গ্রাম

কার্বোহাইড্রেট: ০.৩৬ গ্রাম

আয়রন: ১.৮৯ মিলিগ্রাম

আমেরিকানরা গড়ে প্রতি ব্যক্তি প্রায় ২৮০টি ডিম খায়। এটি প্রতি সপ্তাহে প্রায় পাঁচটি ডিম।

- ডিমে ১.৮৯ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে, যা শক্তি বৃদ্ধি করে এবং আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
- ডিমের কুসুম কোলিনের একটি ঘনীভূত উৎস এই পুষ্টি মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশে সাহায্য করে।
- ডিমের প্রোটিন রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে, হাড়ের স্বাস্থ্য অনুকূল করে এবং পেশীর ভর বৃদ্ধি করে।
- ডিমে ভিটামিন 'এ' সহ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা হার্ট, ফুসফুল, কিডনি এবং অন্যান্য অঙ্গকে সাহায্য করে; এবং ভাল দৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- ডিমে ভিটামিন 'ডি' রয়েছে, যা হাড়, দাঁতকে শক্তিশালী করতে এবং ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।

ডিম ও কোলেস্টেরলের সম্পর্ক

গবেষণায় দেখা গেছে যে মাঝারি ডিম খাওয়া প্রশংসনীয়ভাবে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায় না। সপ্তাহে তিন থেকে চারটি ডিমের কম থেকে মাঝারি, রক্তের কোলেস্টেরলের উপর বড় প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয় না যদি না ব্যক্তির উচ্চ কোলেস্টেরল বা টাইপ ২ ডায়াবেটিস থাকে (হার্ভার্ড টিএইচ চ্যান স্কুল অফ পাবলিক হেলথ)।

যদি স্যাচুরেটেড ফ্যাটে ভরপুর খাবার খাওয়া হয় যেমন লাল মাংস বা ফুল ফ্যাট দুগ্ধজাত খাবার, এগুলি কোলেস্টেরলের মাত্রা ডিমের মধ্যে থাকা খাদ্য তালিকাগত কোলেস্টেরলের চেয়ে বেশি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

তবুও, চলমান জীবন যাপনের জন্য ডিম একটি পুষ্টিকর বিকল্প। ডিমে স্যাচুরেটেড ফ্যাট কম থাকে এবং যখন একটি সম্পূর্ণ শস্য এবং রঙিন শাকের সাথে মিলিত হয়, তখন আয়রন এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ একটি সুস্বাদু খাবার তৈরি করে।

ডিমের কোলেস্টেরল যে অধিকাংশ মানুষের জন্য নিরাপদ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলে পরিচালিত অনেক গবেষণায়- যা কয়েক দশক ধরে শত শত মানুষকে অনুসরণ করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক বা অন্যান্য কার্ডিওভাসকুলার রোগের উচ্চহার খুঁজে পাওয়া যায়নি যারা প্রতিদিন একটি ডিম খায়।

প্রতিদিন ৩০০ মিলিগ্রামের নিচে খাদ্য তালিকাগত কোলেস্টেরল রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। একটি বড় ডিমের কুসুমের সাথে প্রায় ১৮৬ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকে।

বেশির ভাগ সুস্থ মানুষ তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি না বাড়িয়ে সপ্তাহে সাতটি ডিম (কুসুমসহ) খেতে পারে। প্রতিদিন একটি করে ডিম খাওয়ার বেশ কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতার হয়েছে।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন (এএইচএ) ২০২০ সালে একটি বৈজ্ঞানিক সাজেশন প্রকাশ করেছে যা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে সুস্থ মানুষ প্রতিদিন একটি সম্পূর্ণ ডিম খেতে পারে নিরাপদে। ডিমের সামগ্রিক পুষ্টির সুবিধা এবং সুবিধার কারণে তারা সুস্থ বয়স্ক প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য প্রতিদিন দুটি ডিম অনুমোদন করে।

অনেক বেশি পরিমানে ডিম খাওয়ার মাত্রা সম্পর্কিত তথ্যের অভাব রয়েছে, কারণ গবেষণায় প্রতিদিন একটি বা দুটি ডিম খাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করা হয়।

যাই হোক, একটি কেস স্টাডি রিপোর্ট করেছে যে একজন ৪৪ বছর বয়সী ব্যক্তি প্রতিদিন ২৫ টি ডিম খেয়েছিলেন। তার কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক ছিল এবং সে সুস্থ্য ছিল। তার মানে এই ফলাফলগুলি এই দেখায় না যে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে ডিম খাওয়া প্রত্যেকের জন্য স্বাস্থ্যকর। (Exception not an Example)

United States Department of agriculture (USDA) ডিমের আকার অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করে। Peewee ডিম, উদাহরণ স্বরূপ, প্রতি ডজন প্রায় ১৫ আউন্স (oz) (৪২৫ গ্রাম) ওজন, যেখানে জাম্বো ডিম প্রতি ডজন প্রায় ৩০ oz (৮৫০ গ্রাম) ওজন। এটি প্রতি পিউই ডিমের প্রায় ১.২৫ oz (৩৫ গ্রাম) এবং প্রতি জাম্বো ডিমের জন্য ২.৫ oz (৭০ গ্রাম)।

ইউএসডিএ ফুড ডাটা সেন্ট্রাল ট্রাস্টেড সোর্স ডাটাবেসের তালিকায় দেখা গেছে যে পুরো ডিমের ৩.৫ oz (১০০ গ্রাম) ৩৭২ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল রয়েছে। কারণ ডিম যত বড় হবে, কোলেস্টেরল তত বেশি।

ডাটাবেস এও নিশ্চিত করে যে ডিমের সাদা অংশে কোলেস্টেরল নেই। এর মানে হল যে যারা ডিমের কোলেস্টেরল গ্রহণ করতে চায়না তারা তাদের ডায়েটে ডিমের সাদা অংশ খেতে পারেন। মানুষের মাঝে বিতর্ক রয়েছে যে ডিমের কোলেস্টেরল অস্বাস্থ্যকর পরিণতির দিকে নিয়ে যায় কিনা।

যাই হোক, সাম্প্রতিক গবেষণার বড় বড় সংস্থাগুলো পরামর্শ দিয়েছে যে একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যের মধ্যে ডিম অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। বেশির ভাগ মানুষের জন্য, ডিম তাদের রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা বা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলবেনা।

যেসব মানুষ তাদের খাদ্য তালিকায় ডিম অন্তর্ভুক্ত করতে চান না তারা বিভিন্ন ধরণের ডিমের বিকল্প ব্যবহার করতে পারেন। এর মধ্যে রয়েছে ডিমের সাদা অংশ।

সামগ্রিভাবে, মনে হচ্ছে ডিম খাওয়া বেশির ভাগ মানুষের জন্য নিরাপদ। যাই হোক, সব খাবারের মতো, আমাদের উচিত ডিম পরিমিত খাওয়া এবং সুষম খাদ্যের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা।

বি:দ্রঃ অনেকে ডিমে এলার্জি ও ইনটলারেন্স আছে তাদের জন্য ডিম না খাওয়াই ভাল হবে।

তথ্যসূত্রঃ হাভার্ড ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশন, USDA, বিভিন্ন জার্নাল।

খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাবার

ড. মো. রবিউল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ফসল শারীরতত্ত্ব ও পরিবেশ বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, ইমেইল:rabiulislam@hstu.ac.bd

খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাবার সবার জন্য নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রবন্ধের শুরুতে একটি ঘটনা তুলে ধরি। মাত্র কিছুদিন আগে বাংলাদেশের নেটিজেনদের ফেইস বুক ওয়ালে সূর্যমুখী ফুলের সাথে হরেক স্টাইলে বাহারি ছবি ভাইরাল হয়। চারদিকে আনন্দ আর আনন্দ! আনন্দের ভিড়ে কৃষককে তার ক্ষেত পাহারাও দিতে হয়েছে। অথচ, কে জানতো ফুল ফল হলে তা কৃষকের অশ্রু হয়ে বাঙলার মাটি ভেজাবে। হয়েছে তাই-ই। কৃষক কার কাছে সূর্যমুখীর বীজ বিক্রি করবে। জানে না। কেউ কেনে না তার এত কষ্টের ফসল। বাংলাদেশের কৃষি খাতকে হুমকির মধ্যে ফেলে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাবার নিয়ে সারাদিন চেঁচামেচি করলে এ সংক্রান্ত সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল' অধরাই থেকে যাবে। যা হোক, খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত কল্পে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি আমার কাছে সুস্পষ্ট মনে হয়।

কৃষক :

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষকের অবদান অপরিসীম। কিন্তু নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের অনিশ্চয়তায়ও তাদের ভূমিকা কম নয়। আজকাল, কৃষকরা অসচেতনতা ও অসাবধানতা বশত পাকা ধানের শীষে বালাইনাশক স্প্রে করছে। লিচু, আম বা এ জাতীয় ফল বাজারে নেয়ার আগের দিন বিকালেও ক্ষতিকর বালাইনাশক স্প্রে করছে। ফসলে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার, হরমোন ব্যবহার করছে। ফলে এসব রাসায়নিকের তাৎক্ষণিক এবং রেসিডুয়াল প্রভাব অনেকাংশে আমাদের নিরাপদ খাদ্য চেইন ভেঙ্গে ফেলছে।

বালাইনাশক ও রাসায়নিক কোম্পানি :

কৃষি উপকরণ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য দেশের বিভিন্ন বালাইনাশক ও রাসায়নিক কোম্পানিগুলির ভূমিকা প্রশংসনীয়। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো যে, এ সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো শুধুমাত্র তাদের প্রোডাক্টের প্রমোশনাল প্রজেক্ট চালায়। কোন রকম এনভায়রনমেন্টাল ও স্বাস্থ্যগত এসেসমেন্ট ছাড়াই তারা কৃষকের কাছে তাদের প্রোডাক্ট তুলে দেয়। এমনকি সঠিক মাত্রা ও ব্যবহার কৃষককে জানানোর ব্যাপারেও কোম্পানিগুলির অনাগ্রহ একদিকে যেমন নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত করে, অন্যদিকে পরিবেশগত ভারসাম্যও দিন দিন নষ্ট হচ্ছে। দেশে জৈব বালাইনাশকের শুরু ও এর ব্যবহার বাড়ানোর ব্যাপারেও কোম্পানিগুলির আগ্রহ একেবারে নেই বললে চলে।

ভোক্তা :

আমাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হলো অন্যের ওপর দোষ চাপানো। আমরা ভোক্তারা কৃষককে গালি দিবো। কোম্পানিগুলিকে গালি দিবো। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রজেক্ট গুলোর সমালোচনা করবো। কিন্তু দেশ ও সমাজের জন্য যা কল্যাণকর তা নিজে করবো না। ভোক্তাদের খাদ্যাভ্যাসের চিরাচরিত রেওয়াজ সত্যিই খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। দেশের অধিকাংশ মানুষ তিন বেলা ভাত খায়। এতে তাদের শরীরে শর্করার অসাম্যতা দেখা যায়। ফলে, এটা একদিকে যেমন নানা রকম স্বাস্থ্যগত জটিলতার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, অতিরিক্ত ধান উৎপাদন করতে গিয়ে ধানের জমিতে অতিরিক্ত সেচ দিতে হচ্ছে। যা আন্ডার গ্রাউন্ডে পানির লেয়ারকমাচ্ছে এবং ধানের জমিতে গ্রিন হাউজ গ্যাস (মিথেন) তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। কাজেই, খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্যের জন্য ভোক্তাদের 'ব্যাল্যান্স ফুড' গ্রহণ করতে হবে। দেশের মানুষ অতিরিক্ত মাত্রায় শুধু সয়াবিনের তেল খাচ্ছে। এতে করেও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়ছে। চাইলেই তারা সরিষা, সূর্যমুখী বা বিভিন্ন নাটের ভোজ্য তেলের ব্যবহার বাড়াতে পারে। কাজেই, নিরাপদ জীবনের জন্য নিরাপদ খাদ্যাভ্যাসের জন্ম দিতে হবে ভোক্তাদের।

ব্যবসায়ী সমাজ :

মাঠ ফসল, শাকসবজি ও ফলমূল অসচেতন কৃষকের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে সরাসরি নানা রকম ক্ষতিকর রাসায়নিক ও হেভি মেটালের সংমিশ্রণে আসে। এরপর ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বড় ব্যবসায়ীরা সংরক্ষণের নামে নানা রকম ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করে। আগের দিন বিকালে কাঁচা টমেটো কিনে রাতে ক্ষতিকর রাসায়নিক প্রয়োগ করে সকালে পাকা টসটসে টমেটো বাজারে বিক্রি করছে। রাসায়নিকের মাধ্যমে কলা পাকাচ্ছে। বাজার থেকে আপেল নিয়ে এসে একটা ঘরের কোণে রেখে দিন। দেখবেন মাসের পর মাস চলে যাবে, পচঁবে না।

সরকারি প্রতিষ্ঠান :

প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় নানা রকম ক্ষতিকর ও মাত্রাতিরিক্ত প্রিজারভেটিভ মেশানোর জন্য প্রসেস ফুড নিরাপদ স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। আজকাল, অনেকে ঘরে বসে বিভিন্ন দেশীয় ঘরোয়া খাবার বা প্রোডাক্ট অনলাইনে বিক্রি করছে। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় এই যে, তারা বিএসটিআই অনুমোদিত না। অনুমোদিত হলেও নিয়মিত টেস্টিং করে স্ট্যান্ডার্ড লেভেল দেখা হয় না।

ফলে, অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে নিরাপদ খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া, বর্ডারগুলোতে ফুড ইন্সপেকশন এর অনেক সীমাবদ্ধতাও লক্ষণীয়।

বাজার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা :

আমাদের দেশের ভঙ্গুর বাজার ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্য শস্য সংরক্ষণের সীমাবদ্ধতাও খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের অন্যতম অন্তরায়। যেসকল শস্য দ্রুত পঁচে যায় তা সংরক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ আমাদের নেই।

জলবায়ুগত পরিবর্তন :

গ্রীণ হাউজ গ্যাসের প্রভাবে বিশ্বের তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিকর যে প্রভাব বিশ্ব দেখবে তাতে বাংলাদেশের অবস্থান মোটামুটি ওপরের দিকে। কাজেই জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের শিক্ষা ও গবেষণা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক প্রজেক্টের সীমাবদ্ধতাও আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য প্রদানে নেগেটিভ প্রভাব ফেলবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিবেশ দূষণ :

দূষণ শব্দটি আমাদের পাতে ভাতের মতো। আর যাই খাই, ভাত চাই চাই। ঠিক তেমনি আমাদের জাতীয় জীবনে দূষণের মাত্রা বাড়ছে তো বাড়ছেই। সমাধানের কোন বালাই নেই দেখে আমি ভাবি এটাও মনে হয় আমাদের রোজকার বিভিন্ন জিনিসের চাহিদার মতো। সোনার মাটি দিন দিন দূষিত হচ্ছে। নির্মল বায়ু দূষিত হচ্ছে। নিরাপদ পানি দূষিত হচ্ছে। শহরগুলিতে শব্দ দূষণ বেড়েই চলছে। তবুও জেনে শুনে আমরা খাদ্যের মোড়কে পলিথিন বা পুরনো পেপার ব্যবহার করছি (বিবিসি নিউজ, বাংলা, ১২ মার্চ ২০২১), ফসলের জমিতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার দিচ্ছি, মাটিতে পলিথিন মেশাচ্ছি, আগাছানাশক দিচ্ছি, যত্রতত্র ময়লা ফেলছি, কলকারখানার বর্জ্য পানিতে ছাড়ছি, বৃক্ষ নিধন করছি, কানে হেডফোন গুজে উচ্চ মাত্রায় হর্ন দিচ্ছি। আর বিপদে পড়লে অন্যকে গালি দিচ্ছি, নিজের অপরাধ ঢাকার জন্য। এভাবেই দূষণ আমাকে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য ঝুঁকিতে ফেলছে দিন দিন।

খাদ্য নিরাপত্তা হলো এরূপ একটি বিষয় যেখানে জনগণ সব সময় ভৌত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পর্যাপ্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে যা তাদের সুস্বাস্থ্য ও কর্মময় জীবনের জন্য স্বাস্থ্যবিধি সম্মত প্রয়োজন মেটায় (এফএও পলিসি ব্রিফ, ২০০৬)। অন্যদিকে, নিরাপদ খাদ্য বলতে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত ভেজালমুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যকে বোঝায় (এইচ.এস.সি প্রোগ্রাম, অর্থনীতি ২য় পত্র, পৃষ্ঠা ১৫৫)। কাজেই, খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য একটি আরেকটির পরিপূরক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে উন্নত দেশের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, তা বাস্তবায়নে আমাদেরকে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে।

এজন্য আমরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অতিসত্ত্বর নিতে পারি।

১। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২। কৃষকদের সচেতন করতে হবে। সেই সাথে মডেল কৃষক গড়ে তুলতে হবে। যারা অন্যান্য কৃষককে তথ্য সরবরাহসহ খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের বিষয়ে দেখাশুনা করবে।

৩। বালাইনাশক ও রাসায়নিক কোম্পানিগুলো প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোন রকম রাসায়নিক, হরমোন বা বালাইনাশক বিক্রি করতে পারবেনা। তাদেরকে প্রোডাক্টের স্বাস্থ্য ও পরিবশগত মূল্যায়ন সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা অফিসে নির্দিষ্ট সময় পরপর জমা দিতে হবে। সে অনুযায়ী তাদের প্রোডাক্ট বিক্রয়ের অনুমতি পাবে। কোম্পানিগুলোকেও কৃষকদের সচেতন করে তুলতে হবে।

৪। ভোক্তা হিসেবেও ভেজালদাতাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সহ জনমত গড়ে তুলতে হবে। সব সময় অমৌসুমি শস্য, শাকসবজি বা ফলের প্রতি আগ্রহ কমাতে হবে।

৫। বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিতে হবে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৬। সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

৭। পরিবর্তিত জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলার প্রস্তুতি থাকতে হবে। সকল প্রকার পরিবেশ দূষণকারীর বিরুদ্ধে সরকারকে জিরো টলারেন্স নীতিতে থেকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৮। সর্বোপরি, দেশের সমস্যা সম্পর্কীয় গবেষণার প্রতি জোর দিতে হবে। চতুর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেসন এর আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়, রিসার্চ ইন্সটিটিউট এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত গবেষণার টেকসই সমন্বয় ঘটাতে হবে। তবেই, সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত সম্ভব হবে বলে মনে করছি।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

২০১৭ সালের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড মূলতঃ সোসাইটির প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পাদন ও সাংগঠনিক অবকাঠামো তৈরীতে ফোকাস করেছে। তদুপরি একটা দীর্ঘ সময় আমরা সবাই করোনা মহামারিতে আতংকগ্রস্থ ছিলাম এবং এখনও আছি। তারপরও আমরা চেষ্টা করেছি প্রতিবছর একটি করে আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স আয়োজন করার। ইতোমধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সহ মোট ৫টি কনফারেন্স সফলভাবে আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি।

সোসাইটির জন্য একটি যুগোপযোগী সংবিধান প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে যা একজন আইনজীবী দ্বারা চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং সোসাইটির নিবন্ধন প্রক্রিয়াধীন। পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত গবেষকগনকে সোসাইটির সদস্য করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও, প্রাইভেট কোম্পানী ইত্যাদি হতে সর্বমোট ১৬০ জন আজীবন সদস্য হয়েছেন। সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে নিরাপদ খাদ্য শষ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একটি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত তথ্যাধি সন্নিবেশ করে ২০২০ সাল হতে বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর বাংলায় সোসাইটির নিজস্ব সাময়িকী (সেফ ফুড ডাইজেস্ট) প্রকাশ করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সহ সংশ্লিষ্ট মানুষের কাছে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে।

সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মানের একটি জার্নাল প্রকাশের প্রক্রিয়া চলমান। সোসাইটির জন্য প্রয়োজনীয় একটি ওয়েবসাইট তৈরী করার কাজ চলমান।

সোসাইটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা-

১. সোসাইটিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে সোসাইটির আজীবন সদস্য সংখ্যা আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে দ্বিগুণে উন্নিত করা।

২. প্রতি বছর ২ দিন ব্যাপী একটি জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স আয়োজন করা।

৩. সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদী নিয়ে বিভাগীয় বা আঞ্চলিক সেমিনার আয়োজন করা।

৪. দ্রুততম সময়ের মধ্যে সোসাইটির নিবন্ধণ সম্পন্ন করা।

৫. বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার খাবার টেবিলে আসা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকল ধাপে খাদ্য নিরাপদ রাখা নিশ্চিত করা।

৬. নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে স্কুল ভিত্তিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালু করা।

৭. গবেষণা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও বিতরনের ব্যবস্থা করা।

৮. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সোসাইটির বিজ্ঞানীদের মাঝে নিবিড় সমন্নয় সাধন করা।

৯. বছরে অন্ততঃপক্ষে ২টি সেফ ফুড ডাইজেস্ট স্মরণিকা প্রকাশনা করা।

১০. খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা এবং এগুলোর যথাযথ প্রয়োগে সক্রিয় সহযোগিতা করা।

১১. সর্বোপরি বাংলাদেশের মানুষের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে একযোগে কাজ করা।

WATER IS LIFE, WATER IS FOOD. LEAVE NO ONE BEHIND.

A theme of World Food Day 2023

Water is essential to life on Earth. It makes up over 50% of our bodies and covers about 71% of the Earth's surface. Only 2.5% of water is fresh, suitable for drinking, agriculture, and most industrial uses. Water is a driving force for people, economies and nature and the foundation of our food. Indeed, agriculture accounts for 72% of global freshwater withdrawals, but like all natural resources, fresh water is not infinite.

Rapid population growth, urbanization, economic development, and climate change are putting the planet's water resources under increasing stress. At the same time, freshwater resources per person have declined 20% in the past decades and water availability and quality are deteriorating fast due to decades of poor use and management, over extraction of groundwater, pollution and climate change. We risk stretching this precious resource to a point of no return.

Today, 2.4 billion people live in water-stressed countries. Many are smallholder farmers who already struggle to meet their daily needs, particularly women, Indigenous Peoples, migrants, and refugees. Competition for this priceless resource is increasing as water scarcity becomes an ever-increasing cause of conflict.

Around 600 million people who depend, at least partially, on aquatic food systems for a living are suffering the effects of pollution, ecosystem degradation, unsustainable practices and climate change.



IT'S TIME TO START MANAGING WATER WISELY

We need to produce more food and other essential agricultural commodities with less water, while ensuring water is distributed equally, our aquatic food systems are preserved, and nobody is left behind.

Governments need to design science and evidence-based policies that capitalize on data, innovation and cross-sectoral coordination to better plan and manage water. They need to support these policies with increased investment, legislation, technologies and capacity development, while incentivizing farmers and the private sector to engage in integrated solutions for a more efficient use of water, and for its conservation.

WHAT CAN YOU DO?

We all need to stop taking water for granted and start improving the way we use it in our daily lives. What we eat, and how that food is produced all affect water. We can make a difference by choosing local, seasonal, and fresh foods, wasting less of it - even by reducing food waste, and finding safe ways to reuse it while preventing water pollution.

Together, we can take water action for the future of food, people, and the planet.

বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৩ এবং বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩

প্রকাশনা উপ-কমিটি

ড. শেখ শাহিনুর ইসলাম	আহ্বায়ক
প্রফেসর ড. এ.কে.এম মোস্তফা আনোয়ার	সদস্য
ড. মো. নূরে আলম সিদ্দিকি	সদস্য
প্রফেসর ড. কেএইচএম নাজমুল হোসাইন নাজির	সদস্য
ডা. মোহাম্মদ সরোয়ার জাহান	সদস্য
ড. আমিনা খাতুন	সদস্য
ড. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রধান	সদস্য
প্রফেসর ড. মো. মহিদুল হাসান	সদস্য
মোহাম্মদ তারেক সরকার	সদস্য
ডা. মোহাম্মদ সাইফুল বাসার	সদস্য
প্রফেসর ড. মো. মাহমুদুল হাসান শিকদার	সদস্য সচিব

বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৩ এবং বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৩

সেমিনার আয়োজক উপ-কমিটি

ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	আহবায়ক
প্রফেসর ড. কেএইচএম নাজমুল হোসাইন নাজির	সহ-আহ্বায়ক
প্রফেসর ড. এ.কে.এম. মোস্তফা আনোয়ার	সদস্য
ড. মো. নূরে আলম সিদ্দিকি	সদস্য
ডা. মোহাম্মদ সরোয়ার জাহান	সদস্য
প্রফেসর ড. মো. মাহমুদুল হাসান শিকদার	সদস্য
ড. শেখ শাহিনুর ইসলাম	সদস্য
ড. আমিনা খাতুন	সদস্য
ড. জাকিয়া রহমান মনি	সদস্য
ড. এম এ মান্নান	সদস্য
ডা. মোহাম্মদ সাইফুল বাসার	সদস্য
ডা. আব্দুর রহমান রাফী	সদস্য
মোহাম্মদ তারেক সরকার	সদস্য
ড. সাজেদা সুলতানা	সদস্য সচিব

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড



ড. মো. রফিকুল ইসলাম
চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার
(লাইভস্টক ডিভিশন)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা



প্রফেসর ড. কেএইচএম নাজমুল হুসাইন নাজির
মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ
ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ



প্রফেসর ড. মো. খালেদ হোসেন
মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ,
ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সাইন্সেস অনুষদ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
দিনাজপুর



ড. মো. নুরে আলম সিদ্দিকী
আন্তর্জাতিক কনস্যালট্যান্ট (ওয়ান হেলথ)
বিশ্ব প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থা, এসিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক
রিপ্রেজেন্টেশন, টোকিও, জাপান



প্রফেসর ড. এ.কে.এম মোস্তফা আনোয়ার
মাইক্রোবায়োলজি এন্ড পাবলিক হেলথ বিভাগ
এনিমেল সায়েন্স এন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়



ড. মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
ডিপার্টমেন্ট অব লাইভস্টক সার্ভিসেস
ওসমানীনগর, সিলেট



প্রফেসর ড. মো. মাসুদুর রহমান
প্যাথলজি বিভাগ, ভেটেরিনারি এন্ড
এনিমেল সায়েন্সেস অনুষদ
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

Life Members

Bangladesh Society for Safe Food

Sl. No.	Name	Designation	Institution
1	Dr. Eusha Islam	Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
2	Dr. Md. Zakir Hassan	Senior Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
3	Dr. Md. Karim Uddin	Research Officer	ICDDRB
4	Dr. Ziban Chandra Das	Professor	BSMRAU
5	Dr. Md. Muklesur Rahman	District Veterinary Surgeon	Department of Livestock Services
6	Dr. Jahangir Alam	Chief Scientific Officer	National Institute of Biotechnology (NIB)
7	Dr. Polysree Pramanik	Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
8	Dr. Mohammad Habibur Rahman Mollah	Secretary General	Bangladesh Veterinary Association
9	Dr. Nasrin Sultana Juyena	Professor	Bangladesh Agricultural University
10	Dr. Chayan Kumer Saha	Professor	Bangladesh Agricultural University
11	Md. Yousuf	General Manager	Best-1 Poultry and Fish Feed
12	Dr. Gadadhar Chandra Shil	Proprietor	Organic Agro Care, Mirpur, Dhaka-1216
13	Md. Azharul Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
14	Dr. Md. Ariful Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
15	Dr. Shubash Chandra Das	Professor	Bangladesh Agricultural University
16	Dr. Mustak Ahammed	Consultant (Health and Beauty)	Magnessa Bangladesh Ltd.
17	Dr. Abdullah Iqbal	Professor	Bangladesh Agricultural University
18	Dr. Kazi Rafiqul Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
19	Dr. Md. Jalal Uddin Sarder	Professor	Rajshahi University
20	Fatema Nasrin Jahan	Senior Program Officer (NRM)	SAARC Agriculture Centre
21	Dr. Begum Fatema Zohora	Professor	Hajee Mohd. Danesh Science and Technology University
22	Dr. Md. Faruk Islam	Professor	Hajee Mohd. Danesh Science and Technology University
23	Dr. ATM Mahbub E-Elahi	Professor	Sylhet Agricultural University
24	Dr. Shah Md. Monir Hossain	Principal Scientific Officer	Bangladesh Agricultural Research Council
25	Dr. Md. Harunur Rashid	Chief Scientific Officer	Bangladesh Agricultural Research Council
26	Dr. Md. Shajedur Rahman	Professor	Hajee Mohd. Danesh Science and Technology University
27	Dr. Nazmi Ara Rumi	Associate Professor	Hajee Mohd. Danesh Science and Technology University
28	Dr. Mir Rowshan Akter	Professor	Hajee Mohd. Danesh Science and Technology University
29	Saifur Rahman	Associate Professor	Bangladesh Agricultural University
30	Dr. Marzia Rahman	Professor	Bangladesh Agricultural University
31	Dr. Muhammad Tofazzal Hossain	Professor	Bangladesh Agricultural University
32	Dr. Mohammad Showkat Mahmud	Senior Scientific Officer	Bangladesg Livestock Research Institute
33	Dr. Md. Abu Yousuf	Scientific Officer	Bangladesg Livestock Research Institute
34	Dr. Md. Taohidul Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
35	Dr. Md. Nuruzzaman Munsi	Senior Scientific Officer	Bangladesg Livestock Research Institute
36	Dr. Md. Rashedul Islam	Professor	Hajee Mohd. Danesh Science and Technology University
37	Dr. Md. Shahiduzzaman	Professor	Bangladesh Agricultural University
38	Dr. Mohammad Shohel Rana Siddiki	Professor	Bangladesh Agricultural University
39	Dr. Md. Mahabubul Alam Tarafder	Senior Scientific Officer	Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
40	Md. Anisul Islam	Consultant	Easy Life
41	Dr. Sk. Ahmad Al Nahid	Associate Professor	Chittagong Veterinary and Animal Sciences University
42	Dr. Md. Hemayatul Islam	Deputy Chief Veterinary Officer	University of Rajshahi
43	Dr. Sultan Ahmed	Professor	Sylhet Agricultural University
44	Dr. Md. Kamruzzaman	Proprietor	Biolab
45	Dr. Mst. Minara Khatun	Professor	Bangladesh Agricultural University

Life Members

Bangladesh Society for Safe Food

Sl. No.	Name	Designation	Institution
46	Dr. Syed Md. Ehsanur Rahman	Professor	Bangladesh Agricultural University
47	Jasim Uddin Ahmed	Professor	Sylhet Agricultural University
48	Dr. Mohammad Abdus Samad	Chief Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
49	Dr. Sattwikesh Paul	Professor	BSMRAU
50	Dr. SM Shahinul Islam	Professor	Rajshahi University
51	Dr. Md. Nurul Haque Mollah	Professor	Rajshahi University
52	Goutam Kumar Deb	Senior Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
53	Dr. Lutfur Rahman	District Veterinary Surgeon	DLS
54	Md. Aiyub Uddin	N/A	Chartered Accountant
55	Moinul Hasan	Assistant Professor	Bangladesh Agricultural University
56	Dr. Md. Kafil Uddin	Senior Scientist	Bangladesh Agricultural Research Institute
57	Md. Bakhtiar Lijon	Microbiologist	Modern Food Testing Laboratory,Chittagong
58	Dr. Md. Tanvir Rahman	Professor	Bangladesh Agricultural University
59	Dr. Abdullah Iqbal	Professor	Bangladesh Agricultural University
60	Dr. Parvin Mustari	Senior Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
61	Dr. Md. Shafiqul Islam	Associate Professor	Bangladesh Agricultural University
62	Zobayda Farzana Haque	N/A	Bangladesh Agricultural University
63	Dr. Md. Ershaduzzaman	Senior Specialist (Livestock)	Bangladesh Livestock Research Institute
64	Dr. Mahbubul Pratik Siddique	Professor	Bangladesh Agricultural University
65	Md Shafiqul Islam Khan	Professor	Patuakhali Science and Technology University
66	Dr. Md. Sazedul Hoque	Professor	Patuakhali Science and Technology University
67	Amrita Pondit	Associate Professor	Bangladesh Agricultural University
68	Dr. Mohammad Ashiqul Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
69	Dr. Md. Mahfuzur Rahman	Professor	Sylhet Agricultural University
70	Dr. S. M. Rafiquzzaman	Professor	BSMRAU, Gazipur
71	Dr. Md. Rashedur Rahman	Professor	Bangladesh Agricultural University
72	Dr. Kabir Uddin Ahmed	Director (AIC)	Bangladesh Agricultural Research Council
73	Dr. Md. Saifullah	Principal Scientific Officer	Bangladesh Agricultural Research Council
74	Dr. S. M. Kamruzzaman	Professor	Rajshahi University
75	Dr. Syed Sakibul Islam	Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
76	Khondokar Mohammad Mozaffor Hossain	Professor	Rajshahi University
77	Dr. Khalid Hussain	Editor	Agrinews24.com
78	Md. Hannan Malik	Executive Director	SEEDS
79	Muhammad Javidul Haque Bhuiyan	Professor	Bangladesh Agricultural University
80	Din Mohammed Dinu	Deputy Director (PR)	Bangladesh Agricultural University
81	Md. Mahmudur Rahman	Associate Professor	NPI university of Bangladesh
82	Tasnima Haque	Nutritionist	Bihs General Hospital
83	Abu Saeid	Assistant Professor	NPI university of Bangladesh
84	Ashrafi Hossain	Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
85	Dr. Maruf Ahmed	Professor	Hajee Mohd. Danesh Science and Technology University
86	Dr. Muhammad Ashik-E-Rabbabi	Professor	Bangladesh Agricultural University
87	Dr. Rezaul Alam	Head	Department of Veterinary, Adorsho PraniSheba Ltd.
88	Dr. Khandaker Muhammad Mahmud Hossain	Proprietor & CEO	Arena Agro Ltd
89	Dr. Hadiuzzaman	Consultant	Veterinary Diagnostics Center, Mymensingh
90	Dr. Md. Mohidul Hassan	Professor	Hajee Mohd. Danesh Science and Technology University

Life Members

Bangladesh Society for Safe Food

Sl. No.	Name	Designation	Institution
91	Dr. Md. Murshidul Ahsan	National Consultant (Anthrax)	PARB Project, DLS, Dhaka
92	Dr. AHM Taslima Akhter	Livestock Specialist	Asian Disaster Preparedness Center
93	Dr. Abdullya Al Mamun	LEO	ULO Office, Damurhuda, Chuadanga
94	Dr. Md. Shariful Islam	Professor	Rajshahi University
95	Dr. Mohammad Jasim Uddin	CEO	Global Agrotech BD Nutrition
96	Dr. Mohammad Sorwar Jahan	Managing Director	Safe Bio Products Ltd.
97	Dr. Mohammad Sadequr Rahman	Marketing Manager	BOL, Paragon House, 5 Mohakhali, Dhaka 1212
98	Dr. Muhammad Saiful Bashar	CEO	Total Agro Care
99	Dr. Md. Selim Ahmed	Professor	Patuakhali Science and Technology University
100	Dr. Md. Yeamin Hossain	Professor	Univetsity of Rajshahi
101	Dr. Md. Tariqul Islam	Professor	Univetsity of Rajshahi
102	Dr. Md.Jahangir Alam	Professor	Sher-e-Bangla Agricultural University
103	Dr.Khondoker Moazzem Hossain	Professor	Khulna University
104	Mr. Soshe Ahmed	Professor	Rajshahi University
105	Dr. Rashida Khaton	Professor	Rajshahi University
106	Dr. Md. Reazul Islam	N/A	Rajshahi University
107	Dr. Md. Monzur Rahman Bhuiyan	General Practitioner	IT General Hospital
108	Dr. Nazmun Nahar Karim	Member Director	Bangladesh Agricultural Research Council
109	Dr. Ali Akbar Bhuiyan	Principal Scientific Officer	Bangladesh Livestock Research Institute
110	Krishibid Lutfor Rahman	Manager	Technoworth Associates Ltd.
111	Dr. Md. Abdul Kafi	Professor	Bangladesh Agricultural University
112	Dr. Khondoker Jahangir Alam	Professor	Patuakhali Science and Technology University
113	Dr. Abul Khair	Director (Retired)	DLS
114	Dr. Mohammad Mohi Uddin	Professor	Bangladesh Agricultural University
115	Dr. Ashish Kumar Samanta	Senior Program Officer (Livestock)	SAARC Agriculturec Centre
116	Dr. Md. Anower Hussain	Professor	Bangladesh Unicersity of Health Sciences
117	Dr. Mohammad Dalower Hossain Prodhan	Senior Scientific Officer	Bangladesh Agricultural Research Institute
118	Eng. Usama Ibn Latif	Manager	Danish Foods Ltd. Shimrail, Siddhirgonj, Narayanganj
119	Mohammed Tarique Sarker	Managing Director	Fishtech Hatchery Ltd.,Uttara, Dhaka 1230
120	Dr. Alam Khan	Professor	Rajshahi University
121	Dr. A.B.M. Rubayet Bostami	Associate Professor	BSMRAU, Gazipur, Bangladesh.
122	Dr. Shib Shankar Saha	Professor	Patuakhali Science and Technology University
123	Dr. Tanjina Atique	Lecturer	Bangladesh University of Health Sciences
124	Dr. Md. Zahirul Alam	Deputy Registrar	Bangladesh Agricultural University
125	Dr. Md. Sulaiman Hossain	Manager	Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
126	Dr. Mohammad Alam Miah	Professor	Bangladesh Agricultural University
127	Md. Mukul Islam	Associate Professor	Dept. of Plant Pathology, HSTU, Dinajpur
128	Md. Mobinul Islam	Lecturer	Dept. of Plant Pathology, HSTU, Dinajpur
129	Dr. M. Ariful Islam	Professor	Bangladesh Agricultural University
130	Dr. Muhammed Rafiqul Islam	PhD Fellow	Bangladesh Agricultural University
131	Dr A.K.M Khasruzzaman	Managing Director	Inter Agro BD Ltd., R-29, H-402, New DOHS, Mohakhali, Dhaka 1206
132	Dr Mohammed Jamil Hossaim	Managing Director	Adyan Agro Ltd., H-459/A, R-31, New DOHS, Mohakhali, Dhaka
133	Dr Bishwajit Roy	Territory Manager	Phibro Animal Health Bangladesh
134	Dr M. Enamul Hoque Azad	CEO	Relife Agrovet Bangladesh, 7/27 Eastern Plaza, Hatir Pool, Dhaka

Life Members

Bangladesh Society for Safe Food

Sl. No.	Name	Designation	Institution
135	Tarek Mahmood Khan	Managing Director	Bengal Agrovet Ltd, 43 Central Road, Flat 5-B, Dhanmondi, Dhaka-1205
136	Mohammad Fayzur Rahman	Managing Director	Avance Asia Ltd, 91/2, Indira Road, Dhaka
137	Khondoker Mohammad Mohsin	Managing Director	United Agro Ltd, H-46, R-16, Sector-12, Uttara, Dhaka-1230
138	Dr Amina Khatun	Assistant Professor	Dept. of Pathology, Sher-E-Bangla Agricultural University
139	Tahmina Sikder	Assistant Professor	Dept. of Pathology, Sher-E-Bangla Agricultural University
140	Dr Mohammad Ashiqur Rahman	AGM	Nourish Agro Ltd, H-39, Sonargaon Janapath Road, Sec-7, Uttara, Dhaka-1230
141	Md Taslim Khan	CEO	Radiant Animal Health, Chaa-46, Uttar Badda, Gulshan, Dhaka-1212
142	Dr Muhammad Abdul Mannan	Assistant Professor	Sher-E-Bangla Agricultural University
143	Dr Abdur Rahman	Lecturer	Sher E Bangla Agricultural University
144	Dr Lutfor Rahman	CEO	Vet Care Lab,181/2-3, Telepara, Chandona Chowrasta, Gazipur
145	Md Sirajul Hoque	Director	Reneta Ltd. Plot No.4 Milk Vita Road, Mirpur 7, Dhaka 1216
146	Dr. Md. Abdul Wares	Faculty Member	Sirajganj Government Veterinary College
147	Dr Mahmudul Hasan Sikder	Professor	Bangladesh Agricultural University
148	Dr Anjuman Ara Bhuiyan	Senior Scientific Officer	National Institute of Biotechnology
149	Mohammad Khorshed Alam	Managing Director	Oriental Pharma Agro Vets Limited. B-2, Bld-11, Flat C4/E, Angee City, Savar, Dhaka
150	Dr. Quazi Shireen Akther Jahan	PSO and Head	Bangladesh Rice Research Institute, Barishal
151	Ajran Kabir	Research Assistant	Bangladesh Agricultural University
152	Sabiha Salam	Product Development Officer	Bright International CTTG,Basugaon, Pubail, Gazipur
153	Dr. Zakiah Rahman Moni	Principal Scientific Officer	Nutrition Unit, BARC
154	Dr Sk. Shaheenur Islam	Deputy Chief Emidemiologist	Divisional Livestock Office, Dhaka, Department of Livestock Services
155	Mir Mohammad Ali	Assistant Professor	Aqualculture Department, Faculty of Fisheries, SAU
156	Dr. Farjana Haq	MPH	Livestock Capacity Development Specialist
157	Dr. Afroja Yasmin	Assistant Professor	Dept of Pathology, BSRMAU
158	Dr Md. Amir Hossain	Professor	Dept of Genetics & Plant Breeding, BAU
159	Dr. Sajeda Sultana	Associate Professor	Sher-E-Bangla Agricultural University

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড (বিএসএসএফ)
এর গর্বিত সদস্য হোন

সদস্য ফি ঃ ৫০০০/- [আজীবন], ১০০০/- [বাৎসরিক]

যোগাযোগ

০১৬৮৭-৪৩৯৪১৫ [সভাপতি, বিএসএসএফ]

০১৭১২-৬২০১৫১ [সাধারণ সম্পাদক, বিএসএসএফ]

ভিজিট করুন

https://bssf-bd.org/join-bssf/

ছবিতে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড

1st International Scientific Conference on Food Safety and Health















2nd National Scientific Conference on Food Safety and Health









3rd International Scientific Conference on Food Safety and Health



২০২০ সালে অনুষ্ঠিত
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড এর
এ.জি.এম শেষে উপদেষ্টা পরিষদ
কর্তৃক নির্বাচিত
নির্বাহী কমিটি ২০২০-২০২২



২০২০ সালে অনুষ্ঠিত
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড এর
কনফারেন্সে উপস্থিত
আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

4th National Scientific Conference on Food Safety & Health



বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড এর
প্রেসিডেন্ট এর কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন
মাননীয় প্রধান অতিথি
প্রফেসর ড. মো. ফরিদুল আলম
ভাইস চ্যান্সেলর
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব
হেল্‌থ সাইন্স



বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুড এর
সাধারণ সম্পাদক এর কাছ থেকে
ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন বিশেষ অতিথি
জনাব মশিউর রহমান
প্রেসিডেন্ট, বিপিআইসিসি

5th International Scientific Conference on Food Safety and Health













5th International Scientific Conference on Food Safety and Health















Installation program
Executive Committee 2023-2024











ইনসেপ্টা নিয়ে এলো

রেডলিভার™ ভেট

মিল্ক থিসল এক্সট্রাক্ট, আর্টিচোক এক্সট্রাক্ট, অ্যালিয়াম-এল এক্সট্রাক্ট, প্রোপাইলিন গ্লাইকল, এল-কারনিটিন, কোলিন ক্লোরাইড সরবিটল, গ্লিসারিন, মিথিওনিন, গ্লিসারাইল পলিইথাইলিনগ্লাইকল রিসিনোলিয়েট, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট

মিল্ক থিসল ও আর্টিচোক সমৃদ্ধ লিভার টনিক

- হেপাটোটক্সিন এবং ফ্রি র‍্যাডিকেল থেকে লিভারকে সুরক্ষিত রাখে
- লিভারের কোষের পুনঃউৎপাদন বৃদ্ধি করে
- ক্ষতিকারক চর্বি কমাতে সহায়তা করে
- লিভারকে সুরক্ষিত রাখে এবং ফ্যাটি লিভার প্রতিরোধে সহায়তা করে
- গবাদিপ্রাণিতে কৃমিনাশক ব্যবহারের পর লিভারের কার্যক্রম পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সহায়তা করে



বাজারজাতকরণে
incepta
ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ
এনিমেল হেল্‌থ এন্ড ভ্যাকসিন ডিভিশন
তেজগাঁও, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রস্তুতকারক
pharmill
Ul. Stefana Stefańskiego 34,
PL 62-002 Suchy Las, Poland

A-4th generation Cephalosporin (Cefquinome Sulphate) Exclusively For Veterinary Use.

A Step Forward in The Treatment of Mastitis.

COBACTAN® 2.5%

Cobactan® 2.5 % is a ready-to-use suspension for injection containing Cefquinome, a 4th generation Cephalosporin.



50 ml multidose vial

Composition
Each ml of Suspension contains 29.04 mg Cefquinome Sulphate (equivalent to 25 mg Cefquinome)

Indications
Treatment of infections caused by bacteria sensitive to Cefquinome, such as:

Cattle
- Respiratory tract infections caused by *Pasteurella multocida* and *Mannheimia haemolytica.*
- Digital dermatitis,infectious bulbar necrosis and interdigital necrobacillosis (foul in foot)
- Acute *E.coli* mastitis with signs of systemic involvement

Calf
- *E.coli* septicaemia

Dosage:

For Cattle: 1mg cefquinome /kg body weight (2ml/50Kg body weight) @ I/M route 24 hrs intervel for consecutive 3-5 days.

For Calf: 2mg cefquinome /kg body weight (4ml/50Kg body weight) @ I/M route 24 hrs intervel for consecutive 3-5 days.

Withdrawal Period: Milk 1 Day, Meat 5 Days.

COBACTAN® LC (Intramammary)


Packing : Pack contains 3 syringes

Composition: Each syringe contains : 75 mg Cefquinome sulphate as active ingredient.

Indications : For the treatment of clinical mastitis in lactating cows caused by *Staphylococcus aureus, Stretococcus uberis, Stretococcus dysgalactiae, Escherichia coli* and other entero-bacteria Susceptible to Cefquinome.

Dosage : One Syringe infused into each quarter of the udder at 12 hrs interval for 3 Times only.
i.e. At 0 hrs (1st tube) - At 12 hrs (2nd tube) - At 24 hrs (3rd tube)

MSD AH : The Science of Healthier Animals™

Exclusive Distributor

BENGAL OVERSEAS LTD.
Paragon House (6th floor), 5 Mohakhali C/A, Dhaka-1212
Phone : +880 - 2222294355 / 66 / 77 ,Fax : 880 - 2222293624
E-mail : bol@bangla.net.bd, Web : www.bengaloverseasltd.com

MSD Animal Health

বাংলাদেশে এই ১ম একমি নিয়ে এসেছে

এন্টিবায়োটিক ও এন্টিকক্সিডিয়ালের
নির্ভরযোগ্য বিকল্প

লিকুইড

ইকসি ভেট

সাইট্রাস অরান্টিয়াম এল.

ECSE Vet

WE NEED
ECSE Vet



For our residual effect-free health

- *E. coli*
- *Eimeria* spp.
- *Clostridium perfringens*
- *Salmonella* spp.

Eliminator



100 ml 500 ml



নিরাপদ ফাইটোজেনিক	নন-টক্সিক ও রেজিস্ট্যান্স-ফ্রি	রেসিডিউয়াল ইফেক্ট-ফ্রি	গ্রোথ প্রমোটার
			

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

পোল্ট্রি: প্রতিরোধে: ১ মি.লি./লিটার খাওয়ার পানিতে (খামারে বাচ্চা আনার পর প্রথম ৫ দিন খাওয়াতে হবে)।
সাপ্তাহিক মাত্রা: ১ মি.লি./লিটার খাওয়ার পানিতে সপ্তাহে ২ দিন।
চিকিৎসায়: ১-২ মি.লি./লিটার খাওয়ার পানিতে ৫ দিন (যখনই লক্ষণ দেখা যাবে)।
অথবা, রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

ভেটেরিনারি বিভাগ একমি

Manufactured by
MPA Barcelona, Spain
Veterinary Medicines and Additives

BioCare
We Care Animals

Biocare Pet Zone

- Vaccination
- Deworming
- Neuter
- Diagnosis
- Treatment
- Surgery
- Spay
- Medicine
- Accessories
- Food
- Grooming
- Supliment

Hotline: 01779 59 39 33
01976 35 06 28

Vet Available from 11am to 9pm

431/C Khilgaon, Dhaka 1219
[Opposite to Model High School, Khilgaon]

Biocare Pet Zone
Biocare Pet Accessories

Email: biocareagrovet@gmail.com

www.biocarepethospital.com

Pet Clinic Mymensingh & Pet Shop

Trusted care for pets...

পেট ক্লিনিক ময়মনসিংহ ও পেট শপ

PET CLINIC MYMENSINGH & PET SHOP

পোষা প্রাণীর চিকিৎসা সেবা, প্রয়োজনীয় ঔষধ, ভ্যাকসিন, খেলনা, খাবার, লিটার ও
অন্যান্য এক্সেসরিস এর জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Our Services

- Vaccination
- Deworming
- Diagnosis
- Treatment
- Surgery
- Neuter
- Spay
- Medicine
- Accessories
- Food
- Grooming
- Supplement
- Ultrasonography
- Health Checkup



Chief Veterinarian

Prof. Dr. Nazmul H. Nazir
DVM, MS, PGD, PhD, Post-Doc
BVC Reg. No.: 1967
Faculty of Veterinary Science
Bangladesh Agricultural University
Mymensingh-2202
WhatsApp: 01976-620151

মেদিনী হাই টাওয়ার এর বিপরীতে, নওমহল গরু খোয়াড় মোড়, সদর, ময়মনসিংহ-২২০০।

TECHNO DRUGS LTD.

Animal Health Division

NEW ARRIVAL

Xfur Injecton (Vet)

Generic Name: Ceftiofur Sodium USP.
Indications: Livestock: Indicated for the treatment of Bovine Respiratory Disease (Shipping Fever, Pneumonia) and Acute Bovine Interdigital Necrobacillosis (Foot rot, Pododermatitis).
Poultry: Indicated for the control of poultry mortality associated with *Escherichia coli.* organisms.



Ticor Oral Solution (Vet)

Generic Name: Tilmicosin USP (as Tilmicosin Phosphate)
Indications: Indicated for the control and treatment of Respiratory tract infections associated with Tilmicosin-susceptible micro-organisms such as *Mycoplasma spp. Pasteruella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinomyces pyogenes* and *Mannheimia haemolytica* in calves, chickens, turkeys and swine.



Cefavet Oral Powder (Vet)

Generic Name: Cefalexin Monohydrate BP
Indications: Indicated for poultry to prevent Early chicks mortality, Treatment of Coryza, Fowl Typhoid, Fowl Cholera, Bacillary White Diarrhea, Colibacillosis, Ganggrenous Dermatitis & to combat secondary bacterial infections associated with viral diseases.



FM (Vet) Injection

Generic Name: Flunixin Meglumine USP
Indications: Indicated for rapid relief of Pain, Inflammation & Fever in the following conditions:
• Bovine Respiratory Diseases (BRD) • Endotoxemia
• Mastitis • Metritis • Muscular Fatigue • Lameness
• Arthritis & Gout



For Further Information:
Product Management Department
J.K. Tower 31, Segunbagicha, Ramna, Dhaka-1000.
www.technodrugsltd.com

Veterinary Use Only

ISO 9001:2015 CERTIFIED

TECHNO DRUGS LTD.
Where innovation never stops...